মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

ভাষান্তর

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ)

প্রকাশক ঃ
জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ
১২-ডি, ২৭/৩২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

লেখক ঃ
হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

অনুবাদ ঃ
আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রকাশ কাল ঃ
প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ, ঢাকা, 'মিনহাজুত্তালেবীন' এর বাংলা অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

'মিনহাজুত্তালেবীন' হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর অত্যন্ত মুল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। এর বিষয়বস্তু বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ঐশী খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফার কার্য পদ্বতি অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে যুগ খলীফার সঠিক আনুগত্য করে মু'মিনগণ কিভাবে সৎপথে চলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে মানব জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এর দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের তরবিয়তের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নসিহতও প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় অবক্ষয় ও অপব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামের সুন্দর আর্দশকে সন্ত্রাসী রূপদান করার চেষ্টা চলছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা, "ওয়া তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিআঁ ওয়ালা তাফার্‌রাকু- "তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান) এর উপর সঠিক আমল করতে হবে। আল্লাহ্‌র রজ্জু অর্থাৎ যুগ খলীফাকে চিনতে হবে এবং তাঁর সঠিক আনুগত্য করতে হবে। 'মিনহাজুত্তালেবীন' আহমদী ভাই-বোন এবং নতুন প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দানে এবং ঐশী খিলাফতের সঠিক আনুগত্য করতে সাহায্য করবে। বাংলা ভাষাভাষি ভাই-বোনেরা যদি বাংলায় অনূদিত এই মুল্যবান পুস্তিকাটি পাঠ করে উপকৃত হন তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সময়োপযোগী এই নেক কাজের জন্য জিল্লুর রহমান একাডেমী অব ওরিয়েন্টল ষ্টাডিজ এবং এই অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্‌তা'লা অতি উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
০২-০২-২০০৬

প্রকাশকের কথা

প্রকাশিত পুস্তিকাটি হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর দু'টি বক্তৃতার সংকলন। এই বক্তৃতা তিনি উর্দূ ভাষায় ১৯২৫ সালে ২৭-২৮ ডিসেম্বর তারিখে সালানা জলসায় জামাতের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। এই বক্তৃতা দু'টি পরবর্তীতে 'মিনহাজুত্তালেবীন' নামে উর্দূ ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মিনহাজুত্তালেবীন এর অর্থ করা হয়েছে 'সত্য সাধকের রাজপথ'। এই বক্তৃতায় হুযূর (রাঃ) আল্লাহ্তাআলার মনোনীত খলীফার পরিচালনাধীন ঐশী জামাতের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করেছেন। ঐশী নেযামের বরকতে মানুষ কিভাবে সত্য সাধনায় ব্রতী হয়ে সঠিক পথে চলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এর রূপরেখা প্রদান করেছেন। মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য নীতিগত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় রোগ-ব্যাধি উপশমের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

মিনহাজুত্তালেবীনের বাংলা অনুবাদ করেছেন মৌঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব এবং এটা পাক্ষিক আহমদীতে ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে মে ২০০১ইং পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ মূল্যবান বক্তৃতাদ্বয় সংরক্ষণ এবং পাঠকের সুবিধার্থে পুনঃ প্রকাশ করা হলো। পুনঃ প্রকাশকালে মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব প্রথম প্রকাশের সময় ভুলত্রুটি যথাসম্ভব সংশোধন করে ভাষা সরল ও পরিমার্জিত করেছেন। অনেক পরিশ্রম করে পুনঃ প্রকাশের প্রুফ দেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে নেক কাজের উত্তম পুরস্কার দিন।

আসল পুস্তকে বিষয়-সূচী দেয়া হয়নি। পাঠকের সুবিধার্থে আমরা বিষয়-সূচী তৈরীর চেষ্টা করেছি। এতে মূল পুস্তকের সাব-হেডিং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে বিষয়-সূচী বোল্ড করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সদস্য এবং এই এলাকার বাংলা ভাষাভাষী ভাইগণ যদি এই মূল্যবান পুস্তক পড়ে উপকৃত হন এবং সত্য সাধনায় সঠিক পথে চলতে পারেন তবেই বাংলায় এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক হবে। এই পুস্তক প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এডভোকেট মুজীবুর রহমান
জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ
ঢাকা।

অনুবাদকের নিবেদন

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই বা আমরা ত্রুটি করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না- (আল কুরআন)

কেবলমাত্র দৈহিক উন্নতি পশুর জন্য যথেষ্ট। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ নামের যোগ্য বলে আখ্যায়িত হতে পারে। মানুষের দৈহিক পুষ্টির জন্যে যেমন পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন তেমনি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্যে তার বিভিন্ন প্রকার ইতিবাচক অনুশীলনের প্রয়োজন। এর অভাব ঘটলে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন প্রপীড়িত হয় অবক্ষয়জনিত নানা প্রকার রোগ-ব্যাধিতে। এ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন নবী-রসূল ও যুগ সংস্কারকগণ। তাঁরা ঐশী নির্দেশে যুগোপযুগী ব্যবস্থাপত্র দিয়ে মানুষকে করেন অবক্ষয়মুক্ত। তাদের মৃত-প্রায় নৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবনে ঘটে নব বসন্তের সমারোহ।

১৯২৫ সনের ২৭-২৮ ডিসেম্বর তারিখের সালানা জলসার বক্তৃতার বিষয়-বস্তু সম্বলিত মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকগণের রাজপথ) পুস্তক খানি আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ও প্রতিশ্রুত সংশোধনকারী হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি এ পুস্তকে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে কিভাবে আদর্শ ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করা যায় এবং অবক্ষয় পীড়িত মানুষকে অবক্ষয় মুক্ত করে পুণ্যবান সচ্চরিত্র মানুষে পরিণত করা যায় সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন। ইতঃপূর্বে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে যারা কলম ধরে ছিলেন তারা নেতিবাচক পদ্ধতি অবলম্বন করে সংশোধনের পথ বাত্‌লে দিয়েছিলেন। আর হযরত মুসলেহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার বৈশিষ্ট্য এই, তিনি ইতিবাচক দিকগুলোকে নির্দেশ করেছেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে।

ওয়াকেফীনে-নওদের জন্যে নির্ধারিত পুস্তকাদি অনুবাদ করতে গিয়ে এ পুস্তকের সাথে আমার পরিচয়। কেবল ওয়াকেফীনে-নওদেরই জন্যে নয় বরং প্রত্যেক শিশুর চরিত্র গঠনের ও চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে মহামূল্যবান পুস্তক এটি। প্রত্যেক পিতা মাতার এ পুস্তক খানি পাঠ করা আবশ্যক এবং মাঝে মাঝেই পাঠ করা আবশ্যক। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কী মূল্যবান পুস্তক আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন অনাগত ভবিষ্যত বিচারের কষ্টি পাথরে এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

এ পুস্তকের অনুবাদে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী। প্রুফ দেখতে আমার স্ত্রী সাদেকা রহমান আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন, আমীন।

আজকের এ পুস্তক প্রকাশনালগ্নে আমার মামী ও পালক মাতা মরহুমা জোহরা বিবির জন্যে সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ রাখছি। মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানি না। তবে তিনি যে আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে লালিত-পালিত করেছেন তা জোর দিয়ে বলতে পারি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, আমীন।

খাকসার

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ — **আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

বিষয় সূচী

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকের রাজপথ)

আল্লাহ্‌র নামে, (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দাতা, বার বার কৃপাকারী। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর মহান রসূলের ওপর আশিস প্রেরণ করি।

হুযূর (রাঃ) তাশাহ্‌হুদ ও তা'আব্বুয পাঠ করার পর কুরআন করীমের যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন এগুলোর বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

'নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে রয়েছে অনেক নিদর্শন- যারা দাঁড়িয়ে ও বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুয়ে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রভু! তুমি এ সব বৃথা সৃষ্টি করো নি। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।

'হে আমাদের প্রভু! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করো, তাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করেছো। প্রকৃতপক্ষে যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনো; সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করো আর আমাদের মন্দকর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ হতে দূরীভূত করো, এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে (শামেল করে) মৃত্যু দাও।

'হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদেরকে তুমি দান করো আর কেয়ামতের দিনে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

'অতএব তাদের প্রভু তাদের ডাকে (এই বলে) সাড়া দিলেন, 'তোমাদের কোন কর্মীর কর্মকে-সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি নষ্ট করবো না। তোমরা একে অপর হতে। অতএব যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে আর আমার পথে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তারা

যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের কাছ থেকে তাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহ দূরীভূত করে দেব আর অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো-যার নিম্নাঞ্চল দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত-আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিদানস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১ঃ১৯৬)।

আমি আল্লাহ্‌তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকে পুনরায় একবার তাঁর সেই নির্দশনকে পূর্ণকারী সাব্যস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও রসূলগণের জন্যে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার তিনি আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিচ্ছেন যে, কোন পার্থিব সম্মানের জন্যে নয় পার্থিব কোন প্রত্যাশায় নয়, কোন ধন-সম্পদের জন্যে নয়, কোন আরাম - আয়েশের উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবল তাঁর সত্তা ও তাঁর নামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে; তাঁর ওপরে ঈমান প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমরা এস্থানে সমবেত হয়েছি। আর আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট এর জন্যে দোয়া করছি যেন তিনি আমাদের নিয়্যত ও সংকল্পকে সঠিক করে দেন এবং আমাদের আমল ও কর্মকে নিষ্ঠাপূর্ণ করে দেন।

এরপর আমি এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি যা আমি আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে এ জলসায় আপনাদের সামনে বর্ণনা করার জন্যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। কিন্তু এ বিষয়-বস্তু উপস্থাপন করার আগে আমি এটা বলে দেয়া প্রয়োজনীয় মনে করি যে, এ বিষয়-বস্তুর দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি এমন কোন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যেগুলোর দিকে জলসা সালানার সময়ে আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। আর দ্বিতীয় যে অংশটি সম্বন্ধে আমি প্রত্যাশা রাখি, আল্লাহ্‌তাআলা চাইলে আজই প্রথমে তা বলে দিব। কেননা, এটি দীর্ঘ বিষয়। আর জ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু যেভাবে অন্যান্য বছরেও আমি এভাবে বলে আসছি, এর তাৎপর্যও পরে বর্ণনা করবো। [এ সময়ে জলসা গাহের ব্যবস্থাপকগণ হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করেন, অধিক সংখ্যক লোক আসা অব্যাহত রয়েছে কিন্তু জলসা গাহে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। লোকদেরকে বলা হোক যেন তারা চাপাচাপি করে বসেন। বাইরে যারা রয়েছেন যাতে তারাও বসতে পারেন।] এরপর হুযূর (রাঃ) বলেন ঃ

এ বছর আমরা অতি বিস্তৃত জলসাগাহ তৈরী করেছিলাম। কিন্তু খোদাতাআলা প্রমাণ করতে চান, আমি তোমাদের প্রত্যাশা থেকেও তোমাদের শ্রোতা বাড়িয়ে দিই। বন্ধুগণ চাপা চাপি করে বসুন যেন সেসব বন্ধু যারা বাইরে থেকে আসেন তারাও বসতে পারেন। বন্ধুগণ গন্ডগোল করবেন না বরং বক্তৃতা

মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমার কাশি হয়েছে আর এর কারণে গলার স্বর বসে গেছে। তবুও আমি খোদাতাআলার নিকট আশা করি, আমি যা কিছু বলতে চাই তিনি আমাকে তা বলার সৌভাগ্য দান করবেন আর বন্ধুগণও শুনতে পাবেন। কিন্তু উপকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। অতএব বন্ধুগণ চুপ করে বসুন আর যা কিছু বলা হয় তা মনযোগ দিয়ে শুনুন।

সবার আগে আমি সেসব ভুল ধারণার কয়েকটি দূর করতে চাই যা আমার ব্যক্তি-সত্তা সম্বন্ধে কোন কোন লোকের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের কোন কোন বন্ধু যারা বাইরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন তারা বলেছেন আর কারও নাম না নিয়ে বলেছেন, (আর আমিও আবশ্যক মনে করি না যে, তাদের নাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি) আমার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি কেবল বসে থাকেন। কাজটা কী করেন? আমরা তো তার কোন কাজ দেখতে পাই না? এজন্যে লোকদের উদ্দেশ্যে, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের কাজ সম্বন্ধে বলছি, যেসব বন্ধুর সে ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যেন তা দূর হয়। কেননা, সন্দেহ বিষের ন্যায় হয়ে থাকে যা শিরা-উপশিরায় অবস্থান নেয় এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ ঘটায়।

আমি যেহেতু নিকট অতীতের দিনগুলো সম্বন্ধে অধিক বিস্তারিত নিজের কাজ সম্বন্ধে বলতে পারি তাই সেগুলো সম্বন্ধে বলছি যেন সেসব বন্ধু জানতে পারেন যে, যতটুকু আমার শক্তি রয়েছে তদনুযায়ী আমি কাজ সম্পন্ন করি। সুতরাং কোন বন্ধু এথেকে অধিক কাজ করার পদ্ধতি বলে দিলে এর ওপর আমল করার জন্যে আমি প্রস্তুত। কিন্তু এখন আমি যে কাজ করি এর বিস্তারিত বিবরণ এই ঃ আমি সকালে নাস্তার পরে মেয়েদের মাদ্রাসায় পড়াই। একটি নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। এতে কয়েকজন শিক্ষিত মহিলাকে ভর্তি করা হয়েছে। আমার তিনজন স্ত্রী ও মেয়েরা এর অন্তর্ভুক্ত। তারা ছাড়া আরও আছে। যেহেতু উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্যে আমরা মহিলা শিক্ষিকা পাচ্ছি না, এ জন্যে চিকেঁ (বাঁশ, নল-খাগড়া প্রভৃতি দ্বারা তৈরী এক প্রকার পর্দা) ফেলে মহিলাদেরকে পুরুষরা পড়িয়ে থাকেন। আজকাল আমি সেসব মহিলাকে আরবী শিক্ষা দিচ্ছি। মৌলবী শের আলী সাহেব ইংরেজী পড়ান আর মাস্টার মুহাম্মদ তোফায়েল সাহেব ভূগোল পড়ান। আমি সোয়া ঘন্টা পর্যন্ত তাদেরকে পড়াই। আসল সময় তো ৪৫ মিনিট নির্ধারিত কিন্তু সকল শিক্ষক কিছু না কিছু সময় বাড়িয়ে দেন। কেননা, নির্ধারিত সময় স্বল্প এবং পাঠ্য-বিষয় বেশি। এরপর সেই কোঠায় যেখানে বন্ধুগণ সাক্ষাৎ করেন সেখানে চলে যাই। আজকাল এর আকৃতি অন্যরূপ। কেননা, সাক্ষাতের জায়গা বের করার জন্যে সেখানকার মালামাল সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমার কাজ করার দিনগুলোতে এর আকৃতি এরূপ হতো যে, এটা পুস্তকাদি দিয়ে পরিপূর্ণ থাকতো। সেখানে এসে আমার দাপ্তরিক কাজ-কর্ম আরম্ভ হয়। প্রায় সোয়া ৯টায় আমি এখানে আসি। এ সময় আমি জামাতের ব্যবস্থাপনার কাজে এবং কাগজাদি ও পরিকল্পনাসমূহ পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে দেখতে থাকি। এ পর্যায়ে দশটার কাছাকাছি সময়ে ডাক এসে যায়। প্রত্যেহ ৬০, ৭০, ৮০, শ' সোয়াশ' পর্যন্ত চিঠি-পত্র আসে। কমপক্ষে দু'আড়াই ঘন্টার কাজ। এ জন্যে এ কাজে আমার সাড়ে বার বা ১টা পর্যন্ত লেগে যায়। এর পর আমি খেতে যাই। পরে যুহরের নামায পড়াতে যাই। নামায পড়ানোর পড়ে পুনরায় এসে জামাতের কাজ করতে অথবা অফিসের কাগজ-পত্র পড়তে বা ব্যবস্থাসমূহ চিন্তা করতে বা কতক উন্নতমানের প্রবন্ধাদি পাঠ করি। কেননা, আমি কয়েকখানা পুস্তক রচনায় হাত দিয়েছি। আসরের নামাযের জন্যে যাই। নামায পড়ানোর পর সেখানে বন্ধুদের নিয়ে কিছু সময় বসি। আর দরস দিতে হলে দরসের জন্যে চলে যাই। অথবা মাগরেবের নামাযের সময় পর্যন্ত বসে চিঠি-পত্রের জবাব লিখি। মাগরেবের নামায পড়াই এবং এরপর রাতের খাবার খেয়ে ইশার নামায পর্যন্ত পড়াশুনা করতে থাকি। আবার ইশার নামায পড়ানোর পরে কাজের উদ্দেশ্যে সেই ঘরেই চলে যাই আর সেখানে রাত ১১-১২টা পর্যন্ত কুরআন করীমের অনুবাদের কাজ করি। আমার জ্ঞান আহরণের জন্যে ব্যক্তিগত পড়াশুনা করি। আর এতে কিন্তু জামাতও উপকৃত হয়। সাড়ে বার বা একটা পর্যন্ত এ পড়াশুনা চলতে থাকে। এরপর যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিই তখন অবসাদের কারণে ঘুম আসে না। চোখের সামনে জিনিস-পত্র দুলতে দেখা যায়। কেননা, অবসাদের কারণে স্নায়ুগুলো কাঁপতে থাকে। এ অবস্থাতেই ঘুম এসে যায়। আবার ফজরের নামাযের পড়ে কাজের এ ধারা আরম্ভ হয়ে যায়।

এ আমার কর্মসূচী যা গত তিন-চার মাস থেকে অব্যাহত আছে। এসব কাজে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব (হাস্তি বারিতাআলা) যা আমি এক জলসার সময় বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিলাম একে প্রায় পুনর্বার লিখেছি। রাত ২/৩ টা পর্যন্ত লিখতে থেকেছি। এমতাবস্থায় আমি যতটুকু মনে করি, আমার সময় থেকে কোন এক মুহূর্ত তেমন বাঁচে না। আমি যে অবসর পাই, এমন কি খাবার খাওয়ার সময়েও আমি জামাতের ব্যাপারে কোন না কোন প্রস্তাবনা ও বিশেষ বিষয়ের ওপরে চিন্তা করতে থাকি। আবার কখনও কখনও এমন হয়, স্ত্রীরা একথা মনে করে কোন কথা জিজ্ঞেস করে নেয় যে, এখন তো তিনি অবসর আছেন। এক্ষেত্রে এ কর্মকে অপসন্দ মনে হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে নীরসভাবে জবাব দিতে বাধ্য হই। কোন বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করছি তোমরা কি তা আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না? তাই কখনও কখনও খাবার

খাওয়ার সময়েও আমাকে চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকতে হয়। চিকিৎসক ও হেকিমগণ বলেন, এভাবে খাবার খেলে খাবার ভালভাবে হজম হয় না। যখন কারও কোন বিরাট কার্য সাধনের চিন্তায় লেগে থাকতে হয় তখন আবার তার হেকিমের পরামর্শ শুনার অবকাশ থাকে কোথায়? আমি কী কাজ করি? আমার সম্বন্ধে এ ধারণার কথা শুনে শুনে আমার সেই 'জনপ্রিয়' ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মনে এসে গেল। তার ব্যাপারে প্রচলিত আছে যে, সে গাধা নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। সাথে তার ছেলেও ছিল। রাস্তায় কোন কোন লোকের সাথে তাদের দেখা হলো। তারা বল্লো, কেমন বোকা দেখেছো তারা হেঁটে যাচ্ছে আর গাধা খালি যাচ্ছে! গাধার পিঠে চড়ে কেন যাচ্ছে না? এ কথা শুনে পিতা গাধার পিঠে চড়ে বসলো। কিছু দূর যাবার পরে কয়েকজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তারা বল্লো, আজকাল 'রক্ত সাদা' হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ স্নেহ-মায়া নেই)। দেখো, ছেলে তো হেঁটে যাচ্ছে আর পিতা গাধায় চড়ে যাচ্ছে। এটা শুনে পিতা নেমে পড়লো আর ছেলেকে গাধায় চড়িয়ে দিলো। কিছু দূর গিয়ে আরো কয়েকজন লোকের সাথে দেখা হলো। তারা বল্লো, দেখো! বুড়ো পায়ে হেঁটে যাচ্ছে আর মস্ত জোয়ান বেটা গাধায় চড়ে যাচ্ছে। এ শুনে তারা উভয়েই পরামর্শ করলো, পিতা বসে গেলেও অভিযোগ করা হয়, পুত্র বসে গেলেও অভিযোগ করা হয়। এখন এটাই ব্যবস্থা যে, উভয়েই বসে যাই। এ পরামর্শ করে উভয়েই গাধার পিঠে চড়ে বসলো। কিছু দূর অগ্রসর হলে আরো কয়েকজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তারা বল্লো, লজ্জা করে না, একটি অবোধ জন্তুর ওপর দুই ব্যক্তিই উঠে পড়েছে! এ শুনে তারা উভয়েই নেমে পড়লো। আবার পরামর্শ করতে লাগলো, এর আগের সব ব্যবস্থাই সমালোচনার যোগ্য ছিলো। এখন কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত চিন্তা করার পরে কেবল এ ছাড়া তাদের কাছে কোন ব্যবস্থাই দৃশ্যমান হলো না যে, উভয়ে মিলে গাধাকে উঠিয়ে নেবে। শেষ পর্যন্ত এভাবেই করলো। কিন্তু গাধা লাথি মারা শুরু করলো এবং একটি পুলের ওপর উল্‌টি খেয়ে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল। পিতা-পুত্র প্রত্যেকের মন জয় করার আকাঙ্ক্ষায় আফসোস করতে করতে ঘরে পৌঁছল। মানুষ যা কিছুই করুক না কেন এতে অভিযোগ উত্থাপিত হতেই থাকে।

আমাদের জামাতে এক তো সেই ধরনের লোক আছে যারা রাত দিন বলতে থাকে, তিনি সর্বদাই কাজে নিয়োজিত থাকেন। কখনও কাজ পরিত্যাগ করেন না। আর একদল তারা, যারা বলেন, কাজই কী করেন, আমরা তো কাজের নমুনা দেখছি না। কাজ দেখেন না এমন লোকদের কথা যদি সত্য হয় আর এটা নিষ্কর্মা বসে থাকার চিহ্ন হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলাও তো কিছু করেন না বলে মনে হয়। কেননা, তাকে কেউ কাজ করতে দেখে না। কাজ বহু প্রকারের হয়ে

থাকে। কিছু মানসিক কাজ আর কিছু দৈহিক। এক ব্যক্তি জাতির দুঃখে দিন-রাত এর প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। যারা দেখছে তারা তো এ প্রসঙ্গে এ কথাই বলবে, নিষ্কর্মা বসে থাকেন। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কি এটা বলতে পারেন যে, একটি ঝুড়ি বহন করছে এমন ব্যক্তি তো কাজ করছে; কিন্তু মানসিক পরিশ্রম করছে এমন এক ব্যক্তি নিষ্কর্মা বসে আছেন। মানসিক পরিশ্রম তো সেই জিনিস যা এক দিন ও রাতে মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম মানুষকে আরও অধিক শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। অথচ মানসিক কাজ দেখা যায় না আর দৈহিক কাজ দেখা যায়। পাশে বসলে এবং সাথে থাকলে মানসিক কাজ বুঝা যায়। গত বছর যখন আমি বিলেতে গিয়েছিলাম তখন কয়েকজন ইংরেজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তারা মুসলমান ছিলেন না। তারা আমাকে কাজে লিপ্ত থাকতে দেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এভাবে কাজ করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আপনি কিছু বিশ্রামও করুন। মানুষের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়া যায়। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- খায়রুকুম খায়রুকুম লে আহলিকুম অর্থাৎ তোমাদের সে-ই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। এথেকে প্রতীয়মান হয়, স্বামীর ব্যাপারে স্ত্রীর সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে মুসলমানগণ হযরত খদীজা (রাঃ)-এর সাক্ষ্য রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষে উপস্থাপন করতেন।

আজ কয় দিন হলো একজন মুবাল্লিগের ব্যাপারে আমার নিকট অভিযোগ এসেছে, তিনি এ কথা বলেছেন। এরপর যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি বল্লেন, অন্যান্য কথা তো ঠিক নয়, অবশ্য আমি এ কথা বলেছি, যে-ব্যক্তি তার সঙ্গে থাকে তার কাছ থেকে এত শক্তি প্রয়োগে কাজ আদায় করেন যে, সে বিরক্ত হয়ে যায়। অতএব আমার সাথে যারা কাজ করে তারা আমার কাজের ধারণা করতে পারে।

খোদাতাআলা আমাকে এমন অভ্যেস দান করেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই আমার পড়াশুনা করার শখ ছিল। বাল্যকাল দ্বারা আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরের যুগ বুঝাতে চাই। আমার স্বাস্থ্য এহেন অভ্যাসের কারণে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, একদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেবের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে আমাকে বলেন, ডাক্তার সাহেব বলেছেন, কমপক্ষে তার সাত ঘন্টা একাদিক্রমে ঘুমান উচিত নচেৎ স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর পরে জোরের সাথে তাগিদ করলেন, একাদিক্রমে সাত ঘন্টা ঘুমাবে নচেৎ স্বাস্থ্য অধিক বিগড়ে যাবে। আরো বল্লেন,

মনে রেখ, যে চিকিৎসকের আদেশ মান্য করে না সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তুমি এ আদেশ পালন করো। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কঠিন রোগের দিনেও আমার ঘুম সাড়ে চার ঘন্টা থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ কারণে এখন স্নায়বিক দুর্বলতা এতই বেড়ে গেছে যে, যেসব লোক আমার পিছনে নামায পড়ে তারা অবহিত আছে, সেই সূরাগুলো যদ্বারা রোজ আমি নামায পড়াই কখনও কখনও আমি তা-ও ভুলে যাই। আর দৃষ্টিশক্তি এত কমে গিয়েছে যে, কখনও কখনও চোখের সামনে অন্ধকার পর্দা ছেয়ে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যের এহেন অবস্থা সত্ত্বেও আমি দিন রাত এভাবে কাজ করি যা আমি বর্ণনা করেছি। আর যেহেতু এ ধরনের চিন্তা-ধারা এ ধরনের অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করে তাই এর ব্যাখ্যা দেয়া আমি প্রয়োজন মনে করি। এখানেই দেখে নাও যেসব বন্ধু জলসা উপলক্ষ্যে এখানে এসেছেন তারা তো মনে করে থাকবেন যে, আমি দু'দিন বক্তৃতা করেছি তো এটা আর এমন কি বড় কাজ! এ বক্তৃতার জন্য আমাকে কতটা পড়াশুনা করতে হয়েছে তারা তা জানে না। আমি যে বিষয়ে বলি সেই বিষয় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের ধ্যান-ধারণা অবহিত হওয়ার জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়। আজকে আমি দিতে চাচ্ছি এ বক্তৃতার কথাই ধরুন না কেন। এর প্রস্তুতির জন্যে আমাকে কমপক্ষে ১২০০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করতে হয়েছে। আমি খুব কমই কোন কথা দলীল-প্রমাণ হিসেবে নিয়েছি। আর এসব পৃষ্ঠা আমি কেবল ধ্যান-ধারণা যাচাই করার নিমিত্তে পাঠ করেছি। একথা ঠিক, আমার মনে যেসব কথা আসে তা কেবল খোদাতাআলার অনুগ্রহেই আসে, কিন্তু খোদাতাআলার অনুগ্রহকে আকর্ষণও করা উচিত। আর এর জন্যে চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। পড়াশুনার প্রয়োজন রয়েছে। চিন্তা-মগ্ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব এ বক্তৃতা একদিনের বক্তৃতা হয় না বরং দীর্ঘ চিন্তা, দীর্ঘ চেষ্টা, দীর্ঘ পড়াশুনার ফলে হয়ে থাকে। আবার জলসার বক্তৃতা এমনিতেই ছেপে যায় না। যারা বক্তৃতার শ্রুতলিপি করেন তারাও গোটা বক্তৃতা পরিপূর্ণভাবে লিখতে পারেন না। কষ্ট করে লিখতে মাসের মত সময় লেগে যায় এবং আমাকে আবার সেই লিখিত বক্তব্যের সংশোধন করতে হয়। যে বিষয়-বস্তু বর্ণনা করা হয় এর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।

এরপর আমি আরেকটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই আর তাহলো এই। বলা হয়, আমি নাকি কম লোকদের সাক্ষাতের সুযোগ দিই। আমি জলসাগুলোর কোনটিতে বলেছিলাম, সাক্ষাৎ নিজের মাঝে অনেক কল্যাণ বহন করে থাকে। এ কারণেই জলসার সময়ে অনেক কাজ-কর্ম থাকা সত্ত্বেও আমি বন্ধুগণকে সাক্ষাতের সময় দিয়ে থাকি। যেসব লোক এভাবে পৃথক সাক্ষাৎ করে তাদের কারও কারও তিন বছরের বিরতির পর এক বছর সাক্ষাতের সুযোগ আসে।

এখন আমি নিজ জামাতের হাজার হাজার লোককে চিনে রাখি এবং তাদেরকে চিনতে পারি। এ সাক্ষাতের পরেও আমি বন্ধুদের পৃথকভাবে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন বিশেষভাবেই এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর এমন কোন কথা বলতে হয় যা মসজিদে বসে বলা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কখনও কখনও এমন হয়, বন্ধুরা আসেন এবং পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করতে চান; কিন্তু পৃথকভাবে সাক্ষাতের সুযোগ যখন দেয়া হয় তখন বলেন, আপনার কাছে আমার দোয়ার জন্যে বলার ছিলো; যদিও একথা তিনি মসজিদেও বলতে পারতেন। কিন্তু এজন্যে আমার সময় থেকে ১৫-২০ মিনিট ব্যয় করে দেন। আমি এর আগে নিজের যে কাজ সম্বন্ধে বলেছি এতে বন্ধুগণের সাথে সাক্ষাতও অন্তর্ভুক্ত। আর যেসব বন্ধু জরুরী কাজের জন্যে পৃথকভাবে সাক্ষাতের আবেদন করেন তাদের আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করার সময় দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমি যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সাধারণত পৃথকভাবে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত করে এমন সব কথা বলা হয় যা সাধারণ মজলিসেও বলা যেতে পারে। এ জন্যে যে-ব্যক্তি পৃথকভাবে সাক্ষাতের কথা বলেন তার সম্বন্ধে আমি আমার সেক্রেটারীকে বলি, জিজ্ঞেস করে নাও, এটা কি এমন জরুরী কাজ যে, পৃথকভাবেই বলা যেতে পারে? আর যখন আসাটাই জরুরী হয় তখন আমি সময় দিয়ে দিই। আমি আমার কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে যেভাবে বলেছি, এথেকে বন্ধুগণ অনুমান করতে পারেন, আমার কোন অবসর নেই। দিন রাত ২৪ ঘন্টা আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। দিন রাতকে ৪৮ ঘন্টা বানিয়ে নেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এটা করতে পারি, স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় কাজগুলো যেমন, খাওয়া, পান করা, প্রস্রাব-পায়খানা করা, ঘুমান প্রভৃতি কাজে স্বল্প থেকে স্বল্পতর সময় ব্যয় করি; কিন্তু এসব প্রয়োজনীয় কাজগুলো বন্ধ তো আর করে দিতে পারি না। এ অবস্থায় আমি বিনা প্রয়োজনে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করার সময় দিলে অন্যান্য কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। অনেক সময় দেখেছি, কোন বন্ধু সাক্ষাতের জন্যে আসলেন তো আমার হাত ধরে ১৫-২০ মিনিট এটাই বলতে থাকেন, আমার জন্যে অবশ্যই দোয়া করবেন। যেহেতু আমি প্রত্যেক বারই এর জবাবে এটা বলতে পারি না, অবশ্যই দোয়া করবো। এজন্যে তাই সময় সময় বলে দিই, হ্যাঁ, অবশ্যই দোয়া করবো। পরে চুপ থেকে তার কথা শুনতে থাকি। আমি এ পদ্ধতিকে বন্ধ করতে চাই। আর এ-ও আপনাদেরই কল্যাণের জন্যে। আমি আমার সময় যেন জরুরী কাজে ব্যয় করতে পারি। এ পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তি আমার অধিক সময় ব্যয় করা ছাড়া দোয়ার জন্যে বল্লে, তার প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি নিবন্ধ হবে। কেননা, আমি মনে করবো তিনি আমার সময়ের কদর করেছেন ও মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু যারা অনেকক্ষণ হাত ধরে থাকেন তাদের সামনে বাহ্যিকভাবে মুখের হাসিতো লেগে থাকে; কিন্তু আমার প্রাণ অস্থির থাকে। কেননা, তার কারণে আমার অমুক কাজের ব্যাঘাত ঘটছে। এ পদ্ধতিতে সাক্ষাতকারীগণকে আমি বাধা দিতে চাই। কিন্তু কেউ

জরুরী কাজের জন্যে আসলে তার সাথে আমি দিন-রাত সাক্ষাৎ করাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আর যেভাবে আমি তাদেরকে ভুল ধরিয়ে দিতে চাই তাহলো বিনা প্রয়োজনে ও বিনা কারণে আমার সময় যেন ক্ষেপণ না করেন। এভাবে আমি তাদের ভুলও ভেঙ্গে দিচ্ছি যারা বলে, সাক্ষাৎ করাই উচিত নয়। যখনই সুযোগ হয় এখানে এসে অবশ্যই সাক্ষাৎ করা উচিত। অবশ্যি একথাও ঠিক, এমন কোন কথা যদি বলতে হয় যা মসজিদে বলা যায় না যেমন, এমন রোগের কথা, নিজের বিশেষ অবস্থার কথা, অন্য এমন আরও কোন কথা হলে আমি পৃথকভাবে সাক্ষাতের জন্যেও প্রস্তুত রয়েছি। এখন তো অনেক সময় এমন হয়, কোন কোন বন্ধু কতগুলো প্রশ্ন লিখে নিয়ে আসেন এবং সেগুলোর ব্যাপারে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করেন। সে সময়ে আমার খুবই আফসোস হয়, এ প্রশ্নগুলো সাধারণ মজলিসে করা হলে অন্যরাও উপকৃত হতেন। যেমন এ প্রশ্ন, নামাযে একাগ্রতা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে? এটা সুস্পষ্ট, এ প্রশ্নের জবাবে অন্য লোকদেরও কল্যাণ লাভ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্নকারী ব্যক্তি আলাদা সময় নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং সাধারণ লোকদেরকে এর উপকার থেকে বঞ্চিত রাখেন। এ ধরনের পৃথকভাবে সাক্ষাতকারীকে বিরত রাখতে চাই। নচেৎ কুরআন মাজীদেও সাক্ষাৎ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন-*কূনূ মাআস্ সদেকীন*। আল্লাহ্তাআলার সাথে যে লোকের প্রকৃত সম্পর্ক রয়েছে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাক। অতএব সাক্ষাৎকার জরুরী বিষয়। এমন জরুরী বিষয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলতেন, যে-ব্যক্তি আমার নিকট আসে না তার ঈমানের আশঙ্কা আছে। কোন কোন লোক এরূপ আছেন যারা এখানে তো আসেন; কিন্তু মজলিসে অন্যদের পিছনে বসে থাকেন এবং পরে চলে যান। তারা মনে করেন, আমি তাদের দেখে থাকবো। কিন্তু আমার পরিবারের লোকদের চক্ষু এ রকমের যে, ওপরের দিকে অধিক তাকাতে পারে না। (চোখের) ওপরের দিকে মাংস বেশি। এর কারণে দৃষ্টি নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। আর বেশি খুললে কষ্ট হয়। অতএব যেসব বন্ধু এখানে আসেন তাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদেরকে এটাও বলা দরকার, তারা যতদিন থাকবেন, তাদের থাকার জায়গা সম্বন্ধেও জানা থাকা আবশ্যক। এভাবে তাদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং তাদের জন্যে দোয়ায় মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

এরপর আমি আরেকটি সন্দেহের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে চাই। কোন কোন বন্ধুর এ ধারণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তারা বলেন, দোয়ার জন্যে লিখলে লাভ কী? আর তিনি এত লোকের জন্যে কি করে দোয়া করবেন?

কারও যদিও এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যেসব বন্ধুর দোয়ার চিঠি আসে এদের জন্যে আমি আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আলাদা বসে দোয়া করি, তাহলে এটা ঠিক নয়। আমি যে এভাবে করি না এতে সন্দেহ নেই আর করতেও পারি না।

কাদিয়ানের টোকা (Slip) মিলিয়ে দৈনিক শ' খানেকের কাছাকাছি দোয়ার চিঠি আসে এবং কোন কোন লোক দোয়ার জন্যে এমন চিঠি-পত্র লেখেন যে, আমাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবেন। আর তাদেরকে এতে শামেল করা হলে এর সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। তাদের জন্যে এক এক মিনিট করে আলাদা সময় দোয়ার জন্যে নির্ধারিত করা হলে এবং ইসলামের প্রয়োজনগুলোকে এর সাথে ধরা হলে তিন চার ঘন্টা কেবল এক বারের দোয়ার জন্যে আবশ্যক হবে। এ জন্যে আমি এভাবে করি যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও করতেন। তাঁর পদ্ধতি ছিলো, পত্রগুলো পড়া হতো আর তিনি দোয়া করতে থাকতেন। আমিও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি। এ কারণে পত্রও বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে পড়া হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময়েই এমন হতে থাকে, একটি পত্র সেক্রেটারীর হাতে থাকে আর আমাকে শুনানো হয়। কিন্তু আমি বলি, এতে এটা লেখা নেই সেটা লেখা আছে এবং আমার কথা সত্য প্রমাণিত হয়। মোটকথা দোয়ার জন্যে পত্র পড়ার সময় আমি পূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকি এবং পত্রের গোটা বিষয় আমার মুখস্থ হয়ে যায়। এক তো এভাবে দোয়া করে থাকি। দ্বিতীয়ত আমি এ পদ্ধতি অবলম্বন করি, নফল নামাযে দোয়া করি এবং বিগত দিনগুলোর চেয়ে জামাতের উন্নতি আর অসুবিধাগুলো দূর হওয়ার জন্যে প্রত্যেক ফরয নামাযেও দোয়া করি। এ দোয়ায় এ ছাড়া রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করি এবং হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের জন্যেও দুরূদ পাঠিয়ে থাকি। তাঁর মর্যাদা উচ্চ হওয়ার জন্যে দোয়া করে থাকি, এই বলে খোদাতাআলা তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যসমূহ যেন আমাদের মাধ্যমে পুরো করে দেন। তাঁর অমান্যকারীদের ও তাঁর ওপরে আপত্তি উত্থাপনকারীদের সত্য বুঝার সৌভাগ্য দেন। জামাতের সমস্যাদি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন এবং উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন থেকে কাবুলে শাহাদতের ঘটনা ঘটছিলো তখন প্রত্যেক নামাযে দোয়া করতাম, সেখানে আমাদের ভাইদের সাহায্য ও সহযোগিতা করো এবং তাদেরকে শত্রুর প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখো। আবার এ দোয়াও করি যেন খোদাতাআলা ইসলামের সত্যতা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি দান করেন আর সকল মানুষকে ইসলামে প্রবিষ্ট করেন। পুনরায় গোটা জামাতের জন্যে দোয়া করি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ ঃ খোদাতাআলা জামাতের আর্থিক, দৈহিক, চারিত্রিক, জ্ঞান-ভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যেক প্রকারের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে সব দিকে উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। আবার জামাতের যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি হয়ে থাকে এর জন্যেও দোয়া করি। পুনঃ এ দোয়া করি, যারা আমাকে দোয়ার জন্যে লিখেছেন আল্লাহ্তাআলা যেন তাদের

দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে তাদের জন্যে মুক্তির পথ খুলে দেন। এ সময়ে এসব লোক যাদের দুঃখ-কষ্টের কারণে আমার অন্তরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় তাদের নাম নিয়ে নিয়ে তাদের জন্যে দোয়া করি।

আবার এ দোয়া করি, হে ইলাহী! আমাদের জামাতের বর্তমান লোকদের ওপরই কেবল অনুগ্রহ করো না বরং তাদের সন্তান-সন্ততির ওপরও অনুগ্রহ করো। আবার জামাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে দোয়া করি। তাদেরকে তাদের কর্তব্য পালনের উপলব্ধি দান করো। তোমার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী করো। লোকদের সহানুভূতি ও সহায়তার পন্থা বলে দাও। জামাতের সাথে তাদের সহায়তা ও সহানুভূতি সৃষ্টি হোক।

পুনঃ যেসব বন্ধু তবলীগের জন্যে গেছেন তাদের জন্যে আর তাদের পরিবারের জন্যে দোয়া করি। আবার যারা দুঃখে-কষ্টে নিপতিত তাদের জন্যেও দোয়া করি। এ দোয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বিনা ব্যতিক্রমে নফল নামায ছাড়া ফরয নামাযেও করি। এখনও যদি কেউ বলে, আমি জামাতের জন্য দোয়া করি না তাহলে তা এমন যেন, কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় বলে, সূর্য উঠে নি। আমি যেভাবে দোয়া করি ৯০ শতাংশ লোক এমন হবে যারা নিজেদের জন্যেও এমনভাবে দোয়া করে না।

আমাকে আরও একটি মতামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আর তা এই কোন কোন লোক বলে, যেহেতু খলীফার সাথে মতভেদ করার সুযোগ আছে তাই তাঁর সাথে আমাদের অমুক অমুক কথায় মতভেদ আছে। আমিই প্রথমে এ কথা উপস্থাপন করেছিলাম, আর আমি এখনও বলছি, খলীফার সাথে মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কথার একটি তাৎপর্য হয়ে থাকে। এথেকে আগে বেড়ে যাওয়া বুদ্ধি-বিবেচনার চিহ্ন নয়। দেখ, কেউ কি বলতে পারে, ডাক্তারের প্রত্যেক মতামত সঠিক হয়। অবশ্যই নয়। ডাক্তার অনেক সময় ভুলও করেন; কিন্তু এতে কেউ বলতে পারে না যে, যেহেতু ডাক্তারের মতামতে ভুল হয় সেজন্যে আমরা আমাদের ব্যবস্থা-পত্র নিজেরাই তৈরী করবো। কেন? এজন্যে যে, ডাক্তার ডাক্তারী কাজ যথারীতি শিখেছেন। আর তার মতামত আমাদের চেয়ে উত্তম। এভাবে উকিল বহু ভুল করে থাকেন, কিন্তু মোকদ্দমায় তার মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। যে-ব্যক্তি কোন কাজ অধিক জানেন এতে তার মতামতকে সম্মান দেখানো হয়। অতএব মতভেদেরও একটি সীমা নির্ধারিত হওয়া দরকার। এক ব্যক্তি, যে খলীফার হাতে বয়াত হয়, খলীফাকে যে খোদাতাআলা মনোনীত করেন এটা তার বোঝা উচিত। আর খলীফার কাজ হলো দিন-রাত লোকদেরকে সঠিক পথ দেখানো এবং ধর্মীয় সমস্যাবলীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা। ধর্মীয়

সমস্যাবলীতে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী। আর তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে সেই সময়ে মতভেদের সুযোগ থাকতে পারে যখন মতভেদকারীদের বিতর্কিত বিষয়ে এক আর এক যেমন দুই-এ ধরনের প্রতীতি জন্মে যে, তারা যে কথা বলছে তা-ই সঠিক। আবার এটাও শর্ত, প্রথমে তারা এ বিতর্কিত বিষয় খলীফার সামনে উপস্থাপন করে এবং বলে, অমুক বিষয়ে আমার এই সন্দেহ। আর খলীফার মাধ্যমে সেই সন্দেহ দূরীভূত করায়। যেভাবে রোগী ডাক্তারকেও বলে দেয়, আমার এ কষ্ট, আপনি রোগের ব্যাপারে আরও চিন্তা করুন। অতএব মতভেদকারীদের এটা অবশ্য-কর্তব্য, যে কথা নিয়ে তাদের সাথে মতভেদ একে খলীফার সামনে উপস্থাপন করে নিজেরাই এর প্রচার যেন শুরু করে না দেয়। নচেৎ একথা বৈধ করে দেয়া হলে, যে কথাই কারো মনে উদিত হয় তা-ই প্রচার করা শুরু করে দেয় তাহলে পরে ইসলামের কিছুই বাকী থাকে না। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। নচেৎ কুরআন শরীফে এ কথা আসতো না, যখন নিরাপত্তা ও ভয়-ভীতির কোন কথা শোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাও। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কি ভুল করে না? করে থাকে। কিন্তু তার মতামতকে সম্মান দেখানো হয়েছে। আর যখন তার মতের মূল্য দেয়া হয়েছে তখন খলীফার মতের মূল্য থাকবে না কেন? প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কথার সঠিক উপসংহারে পৌঁছুতে যোগ্যতা রাখে না। একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তাকওয়ার চাহিদা পূরণে ১০০টি বিয়েও করে তাহলে এটা তার জন্যে বৈধ। এক ব্যক্তি একথা শুনে অন্যান্য লোকদের নিকট এসে বল্লো, এখন আর চারটি বিয়ের সীমা রেখা থাকলো না। মানুষ ১০০ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে আর এ কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলে দিয়েছেন। তাঁকে (আঃ) যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বল্লেন, আমার তো একথা বলার এই উদ্দেশ্য ছিলো যে, কারও স্ত্রীরা যদি মরতে থাকে তাহলে তার বয়স যা-ই হোক না কেন তাকওয়ার চাহিদা পূরণার্থে সে অনেক বিয়ে করতে পারে।

অতএব সবাই সব কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। আর জামাতের ঐক্যের জন্যে এটা আবশ্যকীয়, কারও কোন কথায় মতভেদ সৃষ্টি হলে তা যেন খলীফার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি এভাবে না করে আর মতভেদকে নিজ মনে পোষণ করে সাধারণ লোকের মাঝে এটা ছড়িয়ে দেয় তাহলে সে বিদ্রোহের কাজ করে। তার নিজের সংশোধন করা প্রয়োজন।

এরপর আমি আর একটি উপদেশ দিতে চাই আর তা হলো এই, হুক্কা খাওয়া খুব খারাপ কাজ। আমাদের জামাতের লোকদের এটা পরিত্যাগ করা উচিত।

কোন কোন লোক আমাকে বলেছেন, আমরা এমন ইলহাম (ঐশীবাণী) লাভকারী দেখেছি, যে হুক্কা সেবন করছিলো আর তার নিকট ইলহাম হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে আমার একটি মজার কাহিনী মনে পড়লো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এটা বলতেন। কয়েকজন বণিক বসে বলা বলি করছিলো, যদি কেউ ১ পোয়া তিল খায় তাহলে তাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। পাশ দিয়ে একজন কৃষক যাচ্ছিলো। সে এটা শুনে পাঞ্জাবী ভাষায় বল্লো- সাল্লিয়া সমেত কে আইনুয়েঁ অর্থাৎ ডালপালাসহ খেতে হবে নাকি ডালপালা ছাড়া? কেননা, সে মনে করলো, একপোয়া তিল খাওয়া এমন আর কি বড় কথা যাতে পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে? বণিকরা বল্লো, ভাই তুমি চলে যাও, আমরা তোমার সাথে কথা বলছি না। তাই স্বভাব ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য হতে পারে। এক ব্যক্তির নিকট যা বড় হয় অন্য ব্যক্তি তা সাধারণ মনে করে। আমরা এটা স্বীকার করে নিলেও সেবনকারীর নিকট খোদার ইলহাম হয়ে থাকলেও বলতে হবে, এ ইলহাম উত্তম মার্গের হবে না। কেননা, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এটা পর্যন্ত বলছেন, রসুন খেয়ে মসজিদে আসবে না। এর দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশ্‌তা আসে না। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সামনে কাঁচা রসুন রাখা হয়েছিলো অথচ তিনি খান নি। সাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরাও খাব না। তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের সাথে খোদা কথা বলেন না, তোমরা খেতে পারো। এ ধরনের হাদীস সত্ত্বেও কি করে এটা মেনে নেয়া যায়, হুক্কা সেবনকারীর নিকট ফিরিশ্‌তা আগমন করে যখন হুক্কার দুর্গন্ধ রসুন থেকেও অধিক খারাপ? আর হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হুক্কা থেকে কম দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিসের ব্যাপারে বলেছেন, এটাকে আমি ব্যবহার করি না। কেননা, আমার নিকট ফিরিশ্‌তা আসে। অতএব যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেন সেক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি ইলহামের দাবীদার বা যার ইলহাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তার হুক্কা সেবন থেকে বিরত থাকা দরকার। যে বলে আমার ইলহাম লাভের আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি তার চেহারা দেখতে চাই। এমন কোন ব্যক্তি না থাকলে কারও হুক্কা সেবন করা উচিত নয়।

আবার আমি বলছি, হতে পারে, এমন ব্যক্তির নিকট ইলহাম যদি হয়েও যায় তাহলে উচ্চ মার্গের ইলহাম হবে না। আর আমরা বলব, সে যদি হুক্কা সেবন না করতো তাহলে তার এথেকে উচ্চ মার্গের ইলহাম লাভ হতো যা হুক্কা সেবনের অভ্যেস থাকার পরও তার লাভ হয়েছে। তার কাছে হয়ত সাধারণ ফিরিশ্‌তা এসে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম লিখেছেন, কোন কোন

নটির নিকটও ইলহাম হয়ে থাকে। তার নিকট ফিরিশ্‌তা যায় কি যায় না? এ রকম ফিরিশ্‌তা হয়ত হুক্কা সেবনকারীর নিকটও গিয়ে থাকবে। কোন হুক্কা সেবনকারীর নিকট যদি ইলহাম হয় তাহলে আমি বলি, এটা তার জন্যে আনন্দের কথা নয়। সে হুক্কা সেবন করা ছেড়ে দিলে তার নিকট উচ্চ মার্গের ফিরিশ্‌তা আগমন করতো।

এরপর আমি এক বন্ধুর মান-সম্মানের উল্লেখ করতে চাই। বিগত মজলিসে শূরাতে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো, তার ইঙ্গিতে সেই কথা প্রশ্নকারী উঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি 'যদি' শর্ত লাগিয়ে বলেছিলাম, যদি তিনি এরূপ করে থাকেন তাহলে ভুল করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল, তিনি এরূপ করেন নি। এ জন্যে যখন রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছিলো তখন তা থেকে সেই অংশ কেটে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফারুক পত্রিকার সম্পাদক সেই ঘটনাকে প্রচার করে দেন। আমার বেশি দুঃখ লেগেছে সেই কথায় যে, ফারুকের ব্যাপারে সেই কথা-বার্তা হয়েছিলো। অথচ ফারুকের পক্ষ থেকে আমিই তো প্রতিবাদ করেছিলাম। অথচ ফারুক যথেষ্ট মনে করে নি। আমি তখন যথাসম্ভব ফারুকের পক্ষ করেছিলাম; কিন্তু ফারুক-এর সম্পাদক এর ওপর ধৈর্য ধারণ করেন নি আর এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রচার করে নিজের এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন। তাই এর খন্ডন সম্মেলনে করছি। এটা যদি কারও খারাপ লেগে থাকে তাহলে সে নিজের ওপর ধিক্কার দিক যে তার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।*

এখন আমি জামাতের আর্থিক অবস্থার ওপর কিছু বলতে চাই। আমাদের জামাতের আর্থিক অবস্থা এ দিনগুলোতে নেহায়েৎ দুর্বল। আমাদের বন্ধুগণ যতদূর সম্ভব সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু এতেও আমাদের প্রয়োজন মিটে না। আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। এসব আমাদের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যদি থাকে তাহলেও আমরা এতটুকুই অংশীদার আপনারা এর যতটুকু অংশীদার। কেননা, এসব অর্থ জামাতের জন্যে প্রয়োজন। এখন কষ্টের যে অবস্থা একে অধিক হতে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, এতে ফেৎনা সৃষ্টি হয়। এখনও এই অবস্থা রয়েছে যে, কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন দেয়া হয় নি। আর তাদের ২৫-৩০ জনের অবস্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই, তারা কয়েক বেলা ধরে অনাহারে আছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একজন পুরনো সাহাবী আমার নিকট এসে কেঁদে ফেল্লেন, এতদিন ধরে উপোস

---

* ফারুক-এর সম্পাদক মু'মিন হিসেবে সে সময় এ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ জন্যে তার প্রতি কোন অভিযোগ নেই।

করছেন। আর কাজ করতে গিয়ে বেহুস হওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আমার মন চায়, ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে কোথাও জঙ্গলে গিয়ে বসি। আত্মহত্যার শামিল না হয় আবার তাই সেই ধারণা থেকে বিরত থাকলাম। এখন মানুষ বুঝতে পারে, এমতাবস্থায় এ ব্যাপারটি দীর্ঘ সময় ধরে মুলতবী রাখা যেতে পারে না। নিঃসন্দেহে বাইরের জামাতের বন্ধুগণকেও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, তারা এমন কোন ধনী ও বড় লোক নয়। কিন্তু আমি বলি, তাদেরও কি এমনই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যেমন এখানে আমাদের করতে হয়? একদিন তো এসব কষ্টের কারণে আমার এরকম মনে হলো যে, আমার ইচ্ছা-শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আর আমি যেন আমার দেহের আচ্ছাদন ছিন্ন-ভিন্ন করতে যাচ্ছিলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের জামাতের ওপর ভারী বোঝা অর্পিত এবং তারা অনেক কিছু খোদার পথে ব্যয়ও করেন। তবুও জামাতকেই গোটা বোঝা উঠাতে হবে। অন্যদের কাছ থেকে তো আমরা কিছু নিতে পারি না। আমি এখনই বলেছি, আমাদের জামাত অনেক দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু জামাতের সামগ্রিক অবস্থা অবলোকন করে আমি বলতে পারি, আমাদের জামাত এখনও এতটা আর্থিক কুরবানী করে নি যতটা কুরবানী প্রাথমিক জামাতগুলো করতো। আমি রোমে সেই স্থান প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মান্যকারীগণ শত্রুদের কঠোরতা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অবস্থান করছিলেন। সেই স্থানটি প্রায় ২০ মাইলের মত দীর্ঘ। খৃষ্টানগণ তাদের ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। আর তারা উপোসের পর উপোস করে চলছিলেন। সূরাতুল কাহ্ফে এদের নাম 'আসহাবে কাহ্ফ' বা গুহাবাসী এবং আর রকীম (ফলক খোদাইকারী) রাখা হয়েছে। আমি কয়েক ঘন্টার জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন কোন বন্ধু সেখানে অবস্থান করা বরদাশ্‌ত করতে পারছিলেন না। যদিও সেসব লোক বহু বছর ধরে দাকিয়ানূসের সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করছিলেন। তা ছিলো এমন গুহা যা নেহায়েৎ কষ্টদায়ক, অন্ধকার ও কর্দমাক্ত। সরকারী সৈন্যরা সেখানে যাদেরকে মেরে ফেলেছিলো তাদের কবরগুলোও সেখানে নির্মিত হয়েছিলো এবং সেগুলোর ওপর স্মৃতিফলক লেখা আছে এই বলে, অমুককে অমুক সময়ে হত্যা করা হয়েছে। এরা সেসব লোক যারা খোদার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এমন কষ্ট সহ্য করেছিলেন যার কথা স্মরণ হলে এখনও দেহের লোম শিউরে ওঠে। আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ) থেকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আবার আপনাদের একথাও মনে রাখা উচিত, আমাদের কুরবানীও হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মান্যকারীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কুরবানী কি এমনই? যখন হযরত মসীহ্

মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি ওসীয়্যত করে না সে মুনাফিক (কপট) আর ওসীয়্যতের হার হলো কমপক্ষে সম্পদের এক দশমাংশ। এতে সাধারণ চাঁদা যা সময়ে সময়ে দেয়া হয় তা অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আমাদের জামাত এখন নিজেদের আয়ের ১৬ ভাগের এক ভাগ চাঁদা দিয়ে থাকে আর কেউ কেউ এ-ও দেয় না বরং মোটেও দেয় না। কিন্তু এছাড়াও বলা হয়ে থাকে, আমাদের ওপর বিরাট বোঝা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, যে কাজ করার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা অতি বিরাট। এখন যেসব লোক বলে, আমাদের ওপর বিরাট বোঝা পড়ে গেছে তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে হাতী উঠাতে গিয়েছিলো। আর যখন উঠাতে ছিলো তখন বল্লো, এ তো খুব ভারী বোঝা। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে হাতে অঙ্গার রাখতে চাচ্ছিলো এবং পরে বল্লো, এতে তো হাত জ্বলে যাচ্ছে। অতএব যে জাতি এটা বলে, তারা দুনিয়াকে এমনভাবে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে যেভাবে ডিনামাইট পাহাড়কে উড়িয়ে দেয়। তাদের জন্যে এটা আবশ্যকীয় যেন তারা ডিনামাইটের ন্যায় ফেটে গিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কখনও কি বারুদ তার অস্তিত্বকে বজায় রেখে কোন বস্তুকে উড়িয়ে দিতে পারে? অথবা ডিনামাইট নিজের ধ্বংস ছাড়া কি কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে? যদি না পারে, আর অবশ্যই পারে না, তাহলে তোমাদের এরূপই করতে হবে। তোমরা স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও যদি বিশ্ব বিজয় করতে চাও তাহলে ডিনামাইটে রূপান্তরিত হয়েই তা করতে পারো। কেননা, ক্ষুদ্র ডিনামাইটই এ রকমই যা বড় অঞ্চলকে ওলট-পালট করে দেয়। আর এর অর্থ এই, আমরা দুনিয়াকে উড়িয়ে দেবার আগে নিজেরা উড়ে যাবো। তোমাদের মাঝে কি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই মার্গ পর্যন্ত তোমরা কি পৌঁছে গেছ? যদি না হয়ে থাকো তাহলে গোটা বিশ্ব-বিজয় করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিভাবে বলতে পারো, তোমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তোমাদের মাঝে প্রত্যেকের নিজের নিজের অবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যে, সে সেই অঙ্গীকারকৃত ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যে কী পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করছে। এটা প্রত্যেক আহমদীর প্রাথমিক কর্তব্য। আর এজন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয় দৃষ্টিপটে রেখে তোমরা এ দায়িত্বকে যদি অবলোকন করো যা তোমরা সেই সময় পর্যন্ত পালন করেছ তাহলে তোমরা জানতে পারবে, এটা তো নগণ্যই মাত্র।

তোমাদের সকলেই এরূপ আমি একথা বলছি না। যাদের এ কথার অনুভূতি নেই, তারা কী উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার নিয়ে দন্ডায়মান হয়েছে এবং এতে কতটা চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন? বড় বড় নিষ্ঠাবান মানুষও আছে। এক বন্ধু, যার মাসিক বেতন ৬০/- টাকা তিনি তার আয়ের এক তৃতীয়াংশের (১/৩) ওসীয়্যত করেছেন

অর্থাৎ মাসিক ২০/- টাকা চাঁদা দিয়ে থাকেন। বিশেষ চাঁদার তাহ্‌রীক হলে তিনি ৩ মাসের বেতন দিয়ে দিলেন আর এভাবে তিনি ঋণী হয়ে গেলেন। এরপর তিনি লিখলেন, আমি কি ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত (১/১০) (এক দশমাংশ) চাঁদা দিতে পারি কিন্তু তার নিকট থেকে ৫-৬ দিন পরে এই বলে চিঠি আসলো, প্রথম চিঠি লেখার পর আমি দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছি। আমি আমার আয়ের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ)-ই চাঁদা আদায় করবো। তাই জামাতের একটি অংশ এমন নিষ্ঠাবান রয়েছে এবং এটা বৃহদাংশ; কিন্তু আমি অবশিষ্ট লোকদের নসীহত করছি যেন তারাও এরূপ হয়ে যান। আর আমাদের তো অবস্থা এই হওয়া উচিত, এক বিন্দুও যেন আমাদের জন্যে না হয় বরং আমাদের জন্যে তা-ই অবশিষ্ট থাকা উচিত যা আমাদের থাকে না-প্রাণ রক্ষার্থে, শরীর ঢাকার জন্যে যা প্রয়োজন তা খরচ করা হয় বাকী সব কিছু যেন খোদার মনে করা হয়। দেখুন আপনারা জামাতে প্রবিষ্ট হয়ে যে অঙ্গীকার করে থাকেন তা কতই না মহান! এর উদ্দেশ্য এই, আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্পদ, আমাদের সম্মান, আমাদের সম্ভ্রম, আমাদের আরাম-আয়েশ, আমাদের দৌলত, আমাদের সহায়-সম্পদ মোটকথা আমাদের সবকিছু খোদার হয়ে গেল। এটা বয়াতের অর্থ। এর সারাংশ এই, যা কিছু আমার তা আমার নয় বরং খোদারই। যেমন ধরুন ১০০/- টাকা মাসিক বেতন যদি হয় তাহলে তা তার নয় বরং খোদার আর যা কিছু এর মাঝে জীবনও অন্তর্ভুক্ত এটাও তার নয়। আবার তার যে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন রয়েছে তা-ও তার নয়। কোন সম্মান বা পদমর্যাদা যা তার রয়েছে তা-ও তার নয়। এসব স্বীকার করার পর কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি চাঁদার তাহ্‌রীক হলে বলে, এটা বড়ই ভারী বোঝা, তখন সে বলুক বয়াত হওয়ার সময়ে সে যে অঙ্গীকার করেছিল এর অর্থ কি? হয় এটা স্বীকার কর, এর অর্থ এই ছিল, বয়াত দ্বারা নিজের সব কিছু বিক্রি করে দেয়ার অর্থ সবটাই দেহ ছিলো না বরং এর অর্থ ছিলো একটি পা বা একটি হাত অথবা এর অর্থ সব সম্পদ ছিলো না বরং এতটুকু সম্পদ ছিলো তাহলে তাকে হিসেবের বাইরে রাখা হোক। কিন্তু যদি এই প্রতিজ্ঞাই ছিলো, আমি আমার সকল সম্পদ, প্রাণ, স্ত্রী, সন্তান, পদ সব তোমাকে দিচ্ছি তাহলে পরে সে কোন্ মুখে বলতে পারে, বড়ই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি? 'বোঝা'র অর্থ তো, যেন সে বলে, যতটুকু দেবার আমি অঙ্গীকার করেছিলাম তাথেকে বেশি দিতে হচ্ছে। অথবা যে-বস্তু দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম তাথেকে আরও অধিক দিতে হচ্ছে। যদিও তার অঙ্গীকার এটাই, সে তার সব কিছু দিয়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় একে 'বোঝা' কিভাবে বলা যেতে পারে? আমি আশা রাখি, সব বন্ধু বয়াতের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবেন। আর ইসলামের জন্যে যা কিছু ব্যয় করতে হবে তা ব্যয় করবেন এবং যতক্ষণ ব্যয় করতে হবে ততক্ষণ করতে থাকবেন। কেননা, যতক্ষণ সেই কথায় আনন্দ

অনুভব না হবে যে, ইসলামের জন্যে সবকিছু কুরবানী করে দেয়া হবে ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমান লাভ হতে পারে না। আমি দোয়া করি, খোদা করুন যেন এমনই হয়।

বর্তমান অর্থ সংকটকে দূরীভূত করার জন্যে আপাতত এ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, যদিও আয়ের বাজেট থেকে খরচের বাজেট ৪০ হাজার অধিক এজন্যে যতক্ষণ এ খরচ সাধারণ আয় থেকে সংকুলান না হয় বিশেষ চাঁদা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হোক। অর্থাৎ আমাদের জামাতের লোক নিজের একমাসের আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ প্রত্যেক বছর চাঁদা আমের অতিরিক্ত আদায় করতে থাকবেন। কোন কোন লোক দুর্বলতা দেখাবে যারা এ বোঝাকে উঠাতে প্রস্তুত হবে না। আমি এতে ভীত নই, এরূপ দুর্বল ব্যক্তি অন্যদের জন্যে শক্তির কারণ হয় না, বরং দুর্বল করার কারণ হয়। সে উন্নতিশীলগণের পথে প্রতিবন্ধক হয়। তার সরে যাওয়াই কল্যাণজনক। অতএব এ কারণে কেউ কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলে তারা সরে যাক। তাদের দিয়ে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না বরং আমাদের কোমর তাদের বোঝা থেকে হালকা হয়ে যাবে।

অতএব যতক্ষণ আমাদের খরচাদি মিটাবার জন্যে সাধারণ আয় যথেষ্ট হয়ে যায় ততক্ষণ বাৎসরিক এক মাসের আয়ের শতকরা ৪০ভাগ বিশেষ চাঁদা হিসেবে দিতে হবে। এ কাজ কিভাবে চলবে আপনারা এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি এখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি না যারা শক্তিশালী বরং যারা দুর্বল তাদের লক্ষ্য করে বলছি, তারা আমাদের জন্য বোঝা হয়ে আছেন। এটা খোদাতাআলার জামাত। আমি এ জায়গাটি সেই সময় দেখেছি যখন এটা বিরান পতিত ছিলো এবং সেই সময়ও দেখেছি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম ভ্রমণের জন্যে বের হতেন তখন এক দু' ব্যক্তি তাঁর সঙ্গী হতেন। আর তারা হতেন তাঁর (আঃ) কাজের লোক। কিন্তু আজ স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নন বরং তাঁর (আঃ) দাসের এ অবস্থা, ভীড়ের মাঝে চোরের ন্যায় পালিয়ে যেতে হয় যেন ভীড় পরিবেষ্টিত হয়ে না যায়। অতএব সেই খোদা যিনি এককে বৃদ্ধি করে এত মানুষ তৈরী করতে পারেন আর তারা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা পাঠাতে পারেন, তিনি ভবিষ্যতেও এ জামাতকে বৃদ্ধি করবেন। এ কারণে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও এ ধারণা পোষণ করতে পারি না, এ জামাত উন্নতি করবে না এবং দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা এর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে। অতএব যাদের অন্তরে মোহর লেগে গিয়েছে আমি সেসব লোক ছাড়া অন্যদের বলছি, খোদার ফযলে এ জামাত সংকটমুক্ত হবে এবং তাদের হাতে খোদাতাআলা বিজয় ও সাহায্য প্রদান করবেন যাদের আজ দুর্বল বলে মনে করা হয়। আসলেই

এ জামাত দুর্বল। দেখ, সেই সেনাপতিকেই সাহসী মনে করা হয়, যে সাধারণ সৈনিকদের নিয়ে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে মহান মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে দেখিয়ে দেয়। আমি আমার জন্যে বলছি না। কেননা, এ জামাত খোদার জামাত, এজন্যে যার নিকটেই খোদাতাআলা এ জামাতের ভার অর্পণ করবেন তাকে সেই প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য দিবেন (এই বলে) যে, আজ যাদেরকে দুর্বল দেখা যাচ্ছে তাদের হাতেই বিজয় লাভ হবে। তারা নিজেদের আত্মার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে করুক কিন্তু আমার সু-ধারণা আছে আর ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা, সে দিন আসবে যখন আমার সুধারণা পূর্ণ হয়েই থাকবে।

পুনরায় আমি বলছি, আর্থিক খরচাদি আমাদের লোকদের নিকট যদি বোঝা বলে মনে হয় তাহলে বন্ধুরা কেন তবলীগের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেন না। জামাতকে বৃদ্ধি দান করতে আমি কবে তাদেরকে বাধা দিয়েছি। তারা সত্বর কেন জামাতকে বাড়াচ্ছেন না যেন এ ভার লাঘব হয়। এটা আমাদের ত্রুটি নয় বরং স্বয়ং নিজেদেরই ত্রুটি। আপনারা যদি জামাতকে বাড়ান তাহলে আর্থিক বোঝা অবলীলায় হ্রাস পাবে। তাহলে আসল কথা তো এটাই, মু'মিনের বোঝা মৃত্যুর পরই কম হয়ে থাকে, জীবদ্দশায় হতে পারে না।

এ উপলক্ষ্যে আমি বন্ধুগণকে এ শুভ সংবাদও শুনাতে চাই এ বছর দু'টি দেশে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই দেশ দু'টোর মাঝে একটিতে যেখানে খৃষ্টানরা ১০০ বছর ধরে তবলীগ করেছিলেন এরপর গিয়ে তাদের কিছু সফলতা লাভ হয়েছিলো; কিন্তু আমাদের মুবাল্লেগগণের কয়েকদিনের চেষ্টায় ১৫-১৬ জন পবিত্রাত্মা মিলে গেছে। এটা সুমাত্রা ও জাভা এলাকায় অবস্থিত। অন্য আরেকটি দেশ রয়েছে। এর নাম নিবার সময় আমার রক্তে নাচন লাগে। এটা হলো ইরান। ইরান সেই দেশ যার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের সম্পর্ক। কেননা, রসূল করীম সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মসীহ্ পারশ্য বংশোদ্ভুত হবে। ইরানের রাজধানীতে বিশ জনের মত লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। আর তাদের প্রসঙ্গে আরো খুশীর সংবাদ এই, সেখানে আমাদের যে মুবাল্লেগ গেছেন তাঁকে আমরা কোন খরচ দেই না। তিনি হলেন শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব। তিনি শাহ্ শুজা-এর বংশধর এবং লুধিয়ানার বাসিন্দা। তিনি ধর্মের সেবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমি তাঁকে ইরানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার সদ্য পত্র থেকে জানা যায়, এমন কয়েকজন লোক আহমদীয়ত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন যারা প্রভাবশালী ও সম্মানিত এবং হাজার হাজার লোকদের ওপর তাদের প্রভাব আছে।

আরো একটি কথা আমি জানতে চাই। খোদাতাআলা কিভাবে আমাদের জামাতকে তবলীগ করাচ্ছেন এতে এটা ধারণা করা যায়। গত বছর তুর্কীস্তানে

কুর্দীদের যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ সাঈদ নামক এক ব্যক্তি। এটা এত বড় বিদ্রোহ ছিলো যে, এটা দমন করার জন্যে তুর্কীদের ৩ লাখ লোককে সমবেত করতে হয়েছিলো। আর প্রধানমন্ত্রী ইসমত পাশার ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে এদের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিলো। শেখ সাঈদকে যখন ধরা হলো আর বিবৃতি নেয়া হলো তখন তিনি বল্লেন, অমুক ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে আমি কখনও বিদ্রোহের পথ বেছে নিতাম না। কেননা, আমি মন স্থির করেছিলাম আমি হিন্দুস্তানে চলে যাবো এবং জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তবলীগ করবো। যদিও তুর্কীরা তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তিনি তার আশা পূরণ করতে পারেন নি। কিন্তু এতে ধারণা করা যায়, সেই দেশের বড় বড় লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। আমার দুঃখ লাগে, এ ব্যক্তি জামাত সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা রাখতেন না; নচেৎ তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতেন না।

আমি আর্থিক সংকটের কারণে বলেছি, সেই সময় পর্যন্ত কোন নতুন কাজ যেন হাত দেয়া না হয় যতক্ষণ অবস্থা ঠিক না হয়। আমেরিকার মিশনের জন্যে এখন খরচ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আগামী বছর থেকে হিন্দুস্তানে বেশি বেশি প্রচেষ্টা চালানো হবে যেন এখানকার জামাত অধিক বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বোঝা বহন করতে সক্ষম হয়। যেখানে এটা আবশ্যক যেন আমাদের জামাত বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করে সেখানে এটাও আবশ্যক, যেসব উপকরণের মাধ্যমে তারা কুরবানী করতে পারে তা-ও যেন বৃদ্ধি করা হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'সোনার ডিমের জন্য মুরগীকে মেরে ফেলা উচিত নয়'। জামাতের আর্থিক সংশোধন ও উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা এজন্যে জরুরী। এজন্যে একেতো এটা আবশ্যক, জামাতের লোকেরা যেন একে অন্যের সাথে সহায়তা করে। বিভিন্ন স্থানে ট্রাঙ্ক-সুটকেস তৈরী, কালি তৈরী, লুঙ্গি তৈরী, ইযারবন্দ বা ফিতা তৈরী, কুলাহ্ বা পাগড়ীর মধ্যের টুপি প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানের আহমদী ব্যবসায়ী যদি আহমদী কারিগরের কাছ থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করে তাহলে তাদের বিক্রী প্রসার লাভ করতে পারে। আর তাদের আয় বেশি হওয়ার কারণে জামাতের লাভ হতে পারে। অতএব আহমদী ব্যবসায়ী আহমদী কারিগরের কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করুন এবং আহমদী খরিদ্দার আহমদী দোকান্দার থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করুন। তাহলে এভাবেও অনেক উপকার হতে পারে। আমাদের মোবাল্লেগগণকে এ কাজে সাহায্য করা উচিত। যেখানেই যান দেখুন, কোন্ আহমদীর কোন্ শিল্প কারখানা আছে। আর যখন অন্য স্থানে যান তখন সেখানকার লোকদের বলুন, অমুক আহমদী অমুক দ্রব্য তৈরী করেন তাথেকে ক্রয় করুন।

আমার দৃষ্টিতে এ প্রসঙ্গে সফলতা দানের সহজ পদ্ধতি এটাও যেন মজলিসে শূরার সময়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয় যাতে আহমদী কারিগর-শিল্পী নিজেদের তৈরী জিনিসপত্র নিয়ে এসে দেখায় যাতে বন্ধুগণ অবহিত হয়ে যায় যে, অমুক জিনিস অমুক স্থান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময়ে সেখান থেকে আনিয়ে নেয়। আবার আহমদীদের উচিত বেকার আহমদীদের চাকুরী প্রদানে চেষ্টা করা। কয়েকজন বন্ধু এ ব্যাপারে খুবই সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই শিথিলতা প্রদর্শন করেন। এভাবে জামাতের লোকদের শিল্প - বাণিজ্য প্রধান নগরগুলোতে গিয়ে ব্যবসা ও শিল্পকর্ম শিখা আবশ্যক।

এভাবে একটি জরুরী বিষয়ে হলো, মৃত ব্যক্তির পেছনে ছেড়ে যাওয়া সন্তান-সন্ততিকে সাহায্য করা। যখন আমরা বলি, সব কিছু ধর্মের জন্যে কুরবানী করে দাও তখন যারা এর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান-সন্ততিগণের জন্যে কিছুই থাকে না। এমন অভাবী লোকদের জন্যে একটি তহবিল গঠন করা জরুরী। এতে চাঁদা দেয়া অবশ্য-কর্তব্য নয়, বরং স্বেচ্ছাধীন। আর এর জন্যে এমন নিয়ম বেঁধে দেয়া দরকার যে, এতে যারা চাঁদা দেবেন তাদেরকে এতদিন পরে এত পরিমাণ নির্ধারিতভাবে দেয়া হবে বা যদি মারা যান তাহলে তার সন্তান-সন্ততিগণকে এত টাকা আদায় করে দেয়া হবে।

এমন কোন তহবিলের ব্যবস্থা যদি হয়ে যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিগণের ব্যবস্থা হতে পারে। এ ব্যাপারে আমি এখন বিস্তারিতভাবে বলতে পারছি না। আমার প্রত্যাশা এই, মজলিসে শূরাতে এটা উপস্থাপন করা হোক এবং একে এমন রঙ্গে রাখা হোক যেন সুদ না হয়, ইন্‌সিউরেন্স না হয় আর কাজও হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এটাই সিদ্ধান্ত করা হোক যে, এতটা বয়স পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিগণের মাসোহারা দেয়া হোক অথবা এমন হোক যেন ছেলে-মেয়েদের এতটা পর্যন্ত লেখা-পড়া করানো হয়।

জামাতের আর্থিক অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এ রকম তাহরীক আবশ্যকীয়। এ সম্বন্ধে প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হবে যেন শরীয়তের দিক থেকে এতে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে আর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মাসোহারারও কোন যথাযথ ব্যবস্থা হতে পারে। এতে আমাদের জামাতের লোকদের এক ধরনের আস্থা সৃষ্টি হতে পারে যে, তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের সন্তান-সন্ততি বিপদে থাকবে না। আসলে মু'মিনের ভরসা তো খোদার ওপরই হয়ে থাকে।

এখন আমি এ বিষয় আরম্ভ করছি যার ওপর আমি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, এ বিষয় সম্বন্ধে বলি। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে আর অসংখ্য লোক আমাকে এ

প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে এবং এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপত্রও চায়। আর সেই প্রশ্ন এই, সেই উপকরণ বা ব্যবস্থা কি যার ওপরে কার্যকরীভাবে আমল করলে মানুষ পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং আত্মায় পুণ্য সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে এর জবাব এই দেয়া যেতে পারে, পুণ্য কাজ করো পুণ্য কাজ করো আর পাপ থেকে রক্ষা পাও পাপ থেকে রক্ষা পাও। কিন্তু যেভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, লোকেরা বলে, আমরা কুরআন করীম পড়েছি, হাদীস পড়েছি, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক পাঠ করেছি এবং পাপ থেকে রক্ষার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা পেতে পারি নি। পুণ্য কাজ করার জন্যে আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারি নি। এখন বলুন আমাদের চিকিৎসা কী? এজন্যে প্রয়োজন, এ দিক থেকে বিতর্ক করা যায় যে, কিভাবে মানুষের এ দুর্বলতা দূর করা যায় যে, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সে পাপ থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সফলতা লাভ করতে পারে নি। যখন আমি এ বিষয়ের ওপর নোট লেখা আরম্ভ করলাম তখন আমি এটা মনে করলাম, এ বিষয় 'ইরফানে ইলাহী' (ঐশী সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিষয়াবলী)-এর কোন কোন অংশের সাথে পুনরাবৃত্তির সৃষ্টি না করে। সেই বক্তৃতাটি পাঠ করলাম। সেই সময়ে আমার মনে হলো, আমি সেই বক্তৃতায় এ বিষয়ে বলার ওয়াদা করেছি। এটা খোদাতাআলার ফযল ও অনুগ্রহ, এখন আমি সেই ওয়াদাকে পূর্ণ করতে যাচ্ছি।

পরে যখন আমি এ বিষয়ের ওপরে চিন্তা করতে থাকলাম তখন একটি অনেক পুরাতন স্বপ্নের কথা আমরা স্মরণে আসলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের এক আধ মাস পরে আমি এ স্বপ্ন দেখেছিলাম। আর সেই সময়ে এর কোন ব্যাখ্যা বুঝতে পারি নি। স্বপ্নটি ছিল এই ঃ আমি নামায পড়ে একটি জায়নামাযে বসে আছি। আমার হাতে একখানা পুস্তক যার সম্বন্ধে আমাকে বলা হলো, ওটা শেখ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেবের পুস্তক এবং এর নাম 'মিনহাজুত্তালেবীন' অর্থাৎ খোদাতাআলা পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন ব্যক্তিদের রাজপথ। আমি সেই পুস্তকখানা পড়ে রেখে দিলাম। পরে হঠাৎ মনে পড়লো, পুস্তকখানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-কে দিতে হবে। এ জন্য আমি তা খুঁজতে লাগলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না। অবশ্য সেটা খুঁজতে খুঁজতে অন্য আর একটি পুস্তক পাওয়া গেল। সেই সময়ে আমার মুখে এ কথা বের হচ্ছিলো- ওমা ইয়া'লাম জুনুদা রব্বিকা ইল্লা হুয়া-আর তোমার প্রভুর সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে তিনি ছাড়া তা আর কেউ অবহিত নয়।

এরপর আমি সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে, শেখ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেবের কোন পুস্তক এ নামে থাকলে তা খুঁজি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বল্লেন, এ নামে তো তাঁর কোন পুস্তক নেই

তবে 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' নামক একটি পুস্তক আছে। পরে জানা গেল, এ নামে অন্য আর কারও কোন পুস্তক নেই। পরে মনে হলো, হতে পারে কোন সময় আমারই এই নামে কোন পুস্তক রচনা করার সৌভাগ্য হবে। আর আব্দুল কাদের-এর অর্থ এই হতে পারে, এতে যা কিছু লেখা হবে তা আমার চিন্তার ফসল হবে না বরং খোদাতাআলা কর্তৃক বুঝানো কথা হবে। এ পুস্তকের নাম এ জন্যে আমি মিনহাজুত্তালেবীন বা সত্য সাধকদের রাজপথ রেখেছি।

এ প্রবন্ধের যে অংশ ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও নাজাত (পরিত্রাণ)-এর মসলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এথেকে কোন কোন অংশকে ছেড়ে দেব আর বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে যা জরুরী সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করবো। আসল কথা তো এই, প্রথমে এ প্রবন্ধের জ্ঞান-বিষয়ক দিক বলা হয়েছে। এখন আমি ব্যবহারিক দিকগুলো বর্ণনা করবো।

এ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে গিয়ে আমরা দেখি, মানব জনমের উদ্দেশ্য কী? খোদাতাআলা স্বয়ং তা বলে দিয়েছেন। বলেছেন-*মা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লিইয়্যা'বুদুন* অর্থাৎ আমি মানুষকে একই কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছি আর তা এই, তারা যেন আব্দ বা দাসে পরিণত হয়ে যায়। আরবী ভাষায় উবুদীয়্যত বা দাসত্ব বলতে 'তাযাল্লাল' বা বিনয় ও নম্রতা বুঝায় আর বিনয় ও নম্রতার তাৎপর্য এই, যে অন্যের ছাপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাই দাসত্বের অর্থ কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়া, ছাপ গ্রহণ করে নেয়া। খোদাতাআলা বলেন, মানুষকে এ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নি যে, সে আমার ছাপ গ্রহণ করে। যখন মানব জনমের উদ্দেশ্য এই তখন আমরা সেই সময় পর্যন্ত একে পূর্ণ করতে সক্ষম হবো না যতক্ষণ খোদাতাআলার গুণাবলীকে নিজেদের মাঝে ধারণ করে না নেবো।

খোদাতাআলা নবীগণকে (আঃ)-ও এ জন্যেই প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ্তাআলা বলেন- *রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রসূলামমিনহুম ইয়াত্লূ আলায়হিম আয়াতিকা ওয়া ইউ'আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম-ইন্নাকা আনতাল 'আযীযুল হাকীম* (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাঝ থেকে তাদের জন্যে এমন একজন রসূল আবির্ভূত করো, যে তাদের নিকট তোমার আয়াতগুলো আবৃত্তি করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে; নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী; পরম প্রজ্ঞাময় (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৩০)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেন- হে আমাদের প্রভু! তাদের মাঝে এমন রসূল প্রেরণ করো যে তাদের মাঝে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনায়। তাদের

শরীয়ত শেখায়, হেকমত ও প্রজ্ঞা শেখায় এবং পবিত্র করে, তুমি প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম প্রজ্ঞাময়। এথেকে জানা যায়, রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ঈমানকে সুদৃঢ় করা, শরীয়ত শেখানো এবং প্রজ্ঞা সেখানো অর্থাৎ জ্ঞানের পরে কার্যে তা পরিণত করা শিখায়। আর এভাবে পবিত্র করে যেন খোদাতাআলার পবিত্র মজলিসে বসার যোগ্য বানিয়ে দেয়।

আমাদের জামাতের জন্যে এ প্রশ্ন কোন সাধারণ প্রশ্ন নয় বরং তাদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। কেননা, বর্তমান সময়ে খোদাতাআলার একজন (উম্মতি) নবী আগমন করেছেন যাঁকে আমরা মেনেছি আর যিনি খোদাতাআলার আয়াতসমূহ আমাদেরকে পাঠ করে শুনান। তাঁকে মেনেও যদি আমরা নোংরা থাকি তাহলে তাঁকে মানার সার্থকতা কি? মৌলভী বোরহান উদ্দীন ঝিল্‌মী অতি পুণ্যবান আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার বলছিলেন, মু'মিনের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা দরকার। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে মৌলভী সাহেব চিৎকার করে কাঁদছিলেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বলতে লাগলেন, পূর্বে আমরা ওহাবী ছিলাম এবং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথা প্রচার করার কারণে আমরা মার খেয়েছি। পরে আপনি আসলেন এবং আমরা আপনাকে মানলাম। এর কারণে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে মার খেলাম। পাথর খেলাম, ক্ষতির সম্মুখীন হলাম। (মৌলবী সাহেব পাঞ্জাবী ভাষায় এসব বলছিলেন যা আমি উর্দূ ভাষায় বলছি। কিন্তু পরের কথাটি আমি উর্দূ ভাষায় বলতে পারছি না তাই পাঞ্জাবী ভাষায়ই পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বললেন-কিন্তু এতসব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও আমি দেখছি, আমি ফের এই "ঝুড়ডে দা জুড় ডো হি রাহ্ইয়া" অর্থাৎ কোন কাজে লাগলাম না)। একজন নবীকে মান্য করার পরে যদি সেই কথাই হয় যে, আমরা নিষ্কর্মা থেকে গেলাম তাহলে আমাদের কী উপকার হলো। আমাদের মাঝে তো এমন সব পরিবর্তন হওয়া উচিত যেন আমরা বুঝি, আমরা জীবন্ত মহামানবদের হাতে আমাদের হাত সমর্পণ করেছি। বরং আমাদের এ রকম মনে হওয়া উচিত, আমরা খোদাতাআলার হাতে নিজেদের হাত সমর্পণ করেছি। নচেৎ আমরা এতে যদি সফলতা লাভ না করি তাহলে যেন আমরা কিছুই করলাম না। দেখ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের নিকট কী প্রত্যাশা করতেন এবং আমাদের কী ভয়ানকভাবে সাবধান করতেন! তিনি আত্মশুদ্ধির প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, "স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের হক ও অধিকারসমূহের সংরক্ষণ করাকে আত্ম-শুদ্ধি বলে। খোদাতাআলার হক্ বলতে বুঝায়, যেভাবে মুখ দিয়ে এক-অদ্বিতীয় শরীকবিহীন বলা হয় তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও ওরূপ মান্য করা হয় এবং সৃষ্টির সাথে শরীক করা না হয়। আর সৃষ্টির হক্ বলতে বুঝায় কারও সাথে

ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা ভাব না রাখা, পক্ষপাতিত্ব না করা, দুষ্টামি না করা, ষড়যন্ত্রমূলক ঝগড়া-ফাসাদপরায়ণ না হওয়া। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌঁছা বড়ই দূরের কথা! এখন আপসে তোমাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারেও তোমরা স্বচ্ছ নও। পরচর্চাও করা হয়। কুৎসাও করা হয়। একে অপরের হক্‌ও বিনষ্ট করা হয়। তাই খোদাতাআলা চাহেন, যতক্ষণ তোমরা একই সত্তার ন্যায় ভাই-ভাইয়ে পরিণত না হও এবং আপসে এক সত্তার বিভিন্ন অঙ্গে রূপান্তরিত না হও ততক্ষণ সফলতার মুখ দেখবে না। মানুষ যখন ভাইয়ের সাথেই আচার-ব্যবহারে স্বচ্ছ না হয় তখন খোদার সাথেও হয় না। নিঃসন্দেহে খোদার হক্‌ বড়; কিন্তু একথা চিনবার দর্পণ হলো এই, খোদার হক্‌ আদায় করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সৃষ্টির হক্‌ আদায় করা হচ্ছে কি হচ্ছে না তা দেখা। যে-ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে আচার-ব্যবহারে স্বচ্ছ নয় সে খোদার সাথেও স্বচ্ছ নয়। এটা সহজ নয়। এটা কঠিন কাজ। সত্যিকারের ভালবাসা এক জিনিষ আর কপটতা অন্য। মু'মিনদের ওপর মু'মিনদের অনেক হক্‌ ও অধিকার রয়েছে। যখন সে রোগাক্রান্ত হয় তখন দেখতে যায় আর যখন মারা যায় তখন জানাযাতে শরীক হয়। সামান্য সামান্য বিষয়ে ঝগড়া করে না, বরং উপেক্ষা করে। তোমরা এসব অমান্য করো খোদার এটা প্রত্যাশা নয়। সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব যদি না থাকে তাহলে জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে" (বদর ১৯০৮, ১ নম্বর, পৃষ্ঠা ১-১৩, আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাম্বিওঁয়াতুব ইলায়কা)।

তাকওয়ার ব্যাপারে এসব হলো হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলায়হেস সালামের উপদেশ। সুতরাং নিজ জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে, হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যে এবং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যে আমাদের ফরয ও অবশ্য-কর্তব্য আমাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টির জন্যে আমরা যেন সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

এখন আমি পরিপূর্ণ মানবের পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছি। যেভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে এটা দেখা হয়, স্বাস্থ্যবান লোক কে? এমনিভাবে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে আমরা জানতে পারি, পরিপূর্ণ মানব কে?

পরিপূর্ণ মানব হওয়ার জন্যে সবচে' অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হলো এই, সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক যেন যথাযথ হয় এবং খোদাতাআলার সাথেও হয়। এ উভয় বিষয়ই আবশ্যকীয় যা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। মানুষের সাথে সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখার বিষয়টিও দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. মানুষের নিজের সত্তার সাথে সম্পর্ক অটুট থাকে যেমন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-**ওয়ালে নাফসিকা আলায়কা হাক্কুন** অর্থাৎ তোমার আত্মারও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।

২. অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক অটুট থাকে। নিজের আত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

ক) মানুষ সেসব বিষয়াদি থেকে বিরত থাকে যা তার অন্তরকে নষ্ট করে দেয়, খ) সেসব বিষয়ের ওপরে আমল করে যা তার অন্তরকে পবিত্র করে। দ্বিতীয় অংশেরও আবার ৩টি ভাগ রয়েছে। অর্থাৎ ১. সমগ্র মানবমন্ডলীর সাথে ব্যক্তি মানবের সম্পর্ক ২. ব্যক্তি মানবের সাথে গোটা জামাতের সম্পর্ক অর্থাৎ দেশের আইন-কানুনের দিক থেকে অন্যান্যদের সাথে সহযোগিতা করার বিষয়, ৩. অন্যান্য মানুষের সাথে তার সম্পর্ক ছাড়াও খোদাতাআলার অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্কও যেন অটুট থাকে।

এরপর আরও দু'টি শাখা আছে ঃ ক) সেসব বিষয় থেকে বিরত থাকে যা মানবমন্ডলী বা অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ককে নষ্ট করে, খ) সেসব বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদ্বারা মানবমন্ডলী বা অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আবার খোদাতাআলার সাথে সুসম্পর্ক রাখারও দু'টি অংশ রয়েছে ঃ ১. সেসব কর্ম থেকে বিরত থাকে যা সে সম্পর্ককে ভঙ্গ করে, ২. সেসব বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদ্বারা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এ বিভক্তির পর আমি ধর্ম ও পথের অর্থ কি তা বলছি। কেননা, এসব কিছুর সার সংক্ষেপ হলো ধর্ম। আর এখন আমি বর্ণনা করছি ধর্মের ব্যাখ্যা কী? ধর্ম দু'টি শাখায় বিভক্ত অর্থাৎ ধর্মের দু'টি অংশ এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য ঃ ১. নৈতিকতা, ২. আধ্যাত্মিকতা। আমি অনেক লোককে দেখেছি যাদের এ ধোঁকা লেগেছে তারা নৈতিকতাকেই ধর্ম মনে করে নিয়েছে। যার নীতি উত্তম তার সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, সে বড় পুণ্যবান ব্যক্তি। অথচ আমরা তার ব্যাপারে এটা বলতে পারি, তার অর্ধেক (কর্ম) তো সঠিক কিন্তু তাকে পুণ্যবান অর্থাৎ ধার্মিক ও খোদা-ভীরু বলতে পারি না।

উত্তম চরিত্রের পরিচয়

মানুষের কর্মের সেই অংশ যা মানবমন্ডলীর সাথে সম্পর্ক রাখে একে আখলাক বা উত্তম চরিত্র বলে। আর সেই আচরণ যখন খোদাতাআলার সাথে করা হয় তখন একে বলে আধ্যাত্মিকতা। কোন লোক যদি (আল্লাহ্‌র) বান্দাদের

সাথে মিথ্যা কথা বলে তখন তা হয় অসদাচরণ আর খোদাতাআলার সাথে যদি মিথ্যা কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় যে, তার আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু ঘটেছে। যখন কারও উভয় দিকের আচরণ সঠিক হয় তখন তিনি ধার্মিক ও খোদা-ভীরু আখ্যায়িত হন। অতএব যখন উত্তম চরিত্র অনুযায়ী শরীয়ত বা বিধি-বিধান পালন করা হয় তখন তা আধ্যাত্মিকতার সাথে মিলিত হয়ে দীন ও ধর্ম নামে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু যখন সেসব কর্মই আধ্যাত্মিকতাবিহীন অবস্থায় সামাজিক সভ্যতার ভিত্তিতে করা হয় তখন এরূপ মানুষের ব্যাপারে বলা হয়-খুবই ভদ্রলোক।

আমি প্রথম পর্যায়ের উত্তম চরিত্র নিয়ে কথা বলবো। পরে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলবো। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, উত্তম চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে পার্থক্য কেবল এতটুকু, মানুষের সাথে আমাদের ব্যবহারে শক্তি নিচয়ের বিকাশকে উত্তম চরিত্র বলে আর সেসব শক্তি খোদার খাতিরে বিকাশ লাভ হলে একে বলে আধ্যাত্মিকতা। এজন্যে যেখানে আমি উত্তম চরিত্র প্রসঙ্গে বলবো সেখানেই সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ও ঘটবে। এবং যেখানে পার্থক্য সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন দেখা দেবে সেখানে পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোকপাত করবো।

উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত, 'খুলক' বা প্রকৃতি ও স্বভাব কী? এ সম্বন্ধে ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম ও দর্শন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত এবং এর অদ্ভুত অদ্ভুত সংজ্ঞা বর্ণনা করেছে, যেমন ১. কারো কারো দৃষ্টিতে 'খুলক' হলো সেই গভীর মূল সম্বলিত যোগ্যতার নাম যা দিয়ে মানবীয় কর্ম বিনা চেষ্টা ও নিয়ম পদ্ধতিতে স্বতস্ফূর্তভাবে অঙ্কুরিত হয় অথবা যার মাধ্যমে মানুষ বিনা চেষ্টা ও নিয়ম পদ্ধতিতে কোন কর্ম করা অস্বীকার করে দেয়। ২. কারও কারও দৃষ্টিতে 'খুলক' সেই পুণ্য মূল-বস্তু যা মানুষের অভ্যন্তরে খোদার সত্তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ৩. কারো কারো কাছে 'খুলক' সেই মূল-বস্তু যা অভিজ্ঞতার পর মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেছে আর এখন উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আমার নিকট 'খুলক' এমন এক অবস্থার নাম যখন প্রাকৃতিক চাহিদাগুলো চিন্তা-শক্তির সাথে সমন্বয় সাধন করা হয় এবং সেসব চাহিদার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনকারী সত্তা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ চাইলে তা দিয়ে কাজ নেয়া হয় বা পরিত্যাগ করা হয়। এ কর্মকান্ড যদি এরূপ সত্তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যার মাঝে চিন্তা করার শক্তি নিহিত না থাকে সেক্ষেত্রে ওগুলোকে স্বভাবজ চাহিদা বলা হয়। যেভাবে জন্তু জানোয়ারের মাঝে পরিদৃষ্ট হয়। জানোয়ার ভালবাসে ও আদর

করে; কিন্তু একে সদাচরণ বলা যায় না। বরং স্বভাবজ চাহিদা বলা হয়। আবার এ রকম কর্ম এমনসব সত্তা থেকে প্রকাশিত হলে যাদেরকে বিশেষ রঙ্গে তৈরী করা হয়েছে যেমন উদ্ভিদ জগৎ বা জড়-জগৎ, সেক্ষেত্রে ওগুলোকে শক্তি ও মহিমার বিকাশ বলা হবে।

বিষয়-বস্তুর এ অংশ কঠিন। কোন কোন বন্ধু যদি এটা বুঝতে না পারেন তাহলে যখন এটা পুস্তকাকারে ছাপা হবে তখন বুঝতে পারবেন। কিন্তু এটা ছাড়া যেহেতু বিষয়-বস্তুর পরবর্তী অংশ বলা যেতে পারে না, তাই এটা বলছি। পরবর্তী অংশ সহজ তাই সবাই বুঝতে পারবেন। আমি উত্তম চরিত্রের পরিচয় বর্ণনা করেছি। উত্তম চরিত্র সেসব কর্ম যা এমন লোকদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যাদের মাঝে চিন্তা করার ও চেষ্টা করার শক্তি থাকে এবং কাজ করার বা না করার সামর্থ্য দেখতে পাওয়া যায়।

এখন আমি উত্তম আচরণ ও চরিত্রের পরিচয় দান করবো। উত্তম চরিত্রের পরিচয় সম্বন্ধেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। যেমন ১. কোন কোন লোকের ধারণা এই, উত্তম চরিত্র বলতে মানুষের শক্তি নিচয়কে বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে ব্যবহার করা বুঝায়।

২. কারও কারও দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র বলতে সেসব কর্ম বুঝায় যা মানুষকে সত্যিকারের আনন্দ প্রদান করে।

৩. অন্যান্য কারও কারও দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র বলতে সেসব কর্ম বা ঈছার (অর্থাৎ পরম ত্যাগ)-এর মাধ্যমে কাজ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যের উপকার করা হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, উত্তম চরিত্র বলতে সেসব কর্মকে বুঝায় যা বুদ্ধি-বিবেকের জ্যোতিতে আর এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরের উপকারের মনোভাব নিয়ে করা হয়।

৫. মুসলমান সূফীগণ বলেন, যেসব কর্ম বুদ্ধি-বিবেক ও শরীয়তের মাধ্যমে করা হয় তা উত্তম চরিত্র।

ইমাম গাজ্জালী উত্তম চরিত্রের এ পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এ পরিচিতি সামান্য সংশোধনীর মুখাপেক্ষী আর সেই সংশোধনী হলো এই, সেসব কর্ম বুদ্ধি-বিবেক ও শরীয়ত মোতাবেকও হয় এবং সাথে সাথে এ বিষয়ও পাওয়া যায় যেন এদের সম্পাদনকারী নিজ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়তির বিধানকে মেনে সে কর্ম করে। এ শর্ত যদি পাওয়া না যায় তাহলে একে উত্তম চরিত্র বলা যেতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় কাউকে

একটি টাকা দিয়ে দেয় এবং জাগ্রত হয়ে সদ্‌কা ও খয়রাত থেকে বিরত থাকে তাহলে সেই অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় সদকা দান করাকে উত্তম চরিত্র বলা যায় না। কেননা, তার সেই কর্ম আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে হবে না। সুতরাং সেই কর্ম উত্তম চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয় যা শরীয়ত ও আক্‌ল-বুদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় করা হয়। আবার অন্য একটি শর্তও আছে। সেসব কর্ম খোদাতাআলার গুণাবলীর অনুকূলে করা হয় প্রতিকূলে করা না হয়। এ পরিচিতিই যথার্থ। কেননা, সৌন্দর্য তা-ই হতে পারে যা দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত। আর আমাদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোন বস্তুকে পবিত্র বল্লেই পবিত্র হতে পারে না। বরং খোদাতাআলার গুণের সাক্ষ্যে যে-বস্তু পবিত্র সাব্যস্ত হয় তা-ই প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হতে পারে আর সৌন্দর্য বলে যথার্থ প্রতিপন্ন হতে পারে। কেননা, কেবল খোদাতাআলার সত্তাই পরিপূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত।

এখন আমি চরিত্রের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। চরিত্র কোথা থেকে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উৎসের কথা বলেছেন। কোন কোন লোক বলেন, চরিত্রের ভিত্তি হলো চিন্তা-শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি, ক্রোধ ও কাম। বুদ্ধি কাজ করে যেমন আরোহী কাজ করে আর ক্রোধ ও কাম শক্তি দু'টি ঘোড়া। বুদ্ধি যখন আরোহী হয়ে এ দু'টো ঘোড়াকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে তখন এটা বৃত্তি বা গুণে পরিণত হয়। আর আরোহী যদি ভুল করে তাহলে অপগুণ সৃষ্টি হয়। মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী এ চিন্তা-শক্তির নাম রেখেছেন নফ্‌সে নাতেকা বা বুদ্ধিমান সত্তা।

তাঁর দাবী এই, সব রকম চরিত্র এ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি ও কাম-শক্তির মিলনে বা বুদ্ধি ও ক্রোধের মিলনে, অথবা তিনটি বৃত্তির একীভূত হওয়ার ফলে। তিনি বুদ্ধিকে পুরুষ হিসেবে এবং ক্রোধ ও কাম-শক্তিকে দু'টি স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেভাবে নারী-পুরুষের সংসর্গে সন্তান জন্ম নেয় তেমনি বলা হয় বুদ্ধির সাথে ক্রোধ-শক্তি বা কাম-শক্তির মিলনের ফলে চরিত্র সৃষ্টি হয়।

কারও কারও দৃষ্টিতে, মানুষের মাঝে আনন্দ লাভ করার শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। এটা যখন বুদ্ধির সাথে সংযোজিত হয় তখন চরিত্র সৃষ্টি হয়।

আমার দৃষ্টিতে মুসলমানগণ কুরআন করীমের আলোকেও চরিত্রের ভিত্তিকে ভালভাবে বুঝে নি। চরিত্রের ভিত্তি অনেক গভীরে এবং অনেক দূরে চলে যায়। আমি কুরআন করীমের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফলে এটা বুঝেছি। মানুষের মাঝে যদি কেবল কাজ-কর্ম পাওয়া যায় যেগুলোকে চরিত্র বলা হয় তাহলে প্রথম দল যে পরিচিতি দান করেছে তা সঠিক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু

এ ধরনের কাজ-কর্ম জড় পদার্থগুলোর মাঝেও দেখা যায়। যেমন, তারা বলে, বুদ্ধি, কাম-শক্তি ও ক্রোধ মিলিত হয়ে চরিত্র সৃষ্টি হয়, আর ভালবাসাও একটি গুণ যা জন্তু-জানোয়ারের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তারা বলে, বুদ্ধি এবং কাম-শক্তি বা বুদ্ধি ও ক্রোধ মিলিত হয়ে সব রকম চরিত্র সৃষ্টি হয়; অথচ জন্তু-জানোয়ারের মাঝে বুদ্ধি নেই। এছাড়াও তাদের মাঝে ভালবাসারূপ গুণ যে চরিত্রের মধ্যে গণ্য তা পাওয়া যায়। এজন্যে জানা গেল, বুদ্ধি, কাম-শক্তি ও ক্রোধ চরিত্রের ভিত্তি নয়। তাহলে জন্তু-জানোয়ারের মাঝে কোন গুণ পাওয়া যেত না।

আমি এ বিষয়ের ওপর চিন্তা করেছি এবং খোদাতাআলার ফযলে আমার কাছে এমন নতুন বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তা চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের মূল কয়েকটি শক্তিতে নিহিত। এ কেবল মানুষের মাঝেই পরিদৃষ্ট হয় না বরং জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা এমন কি জড় পদার্থের মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়। আর কেবল জড় পদার্থের মাঝেই পাওয়া যায় না বরং অণু-পরমাণুর মাঝেও পাওয়া যায় যা দিয়ে জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখে নাও, মানবের পর জন্তু-জানোয়ারের মাঝেও মানব সদৃশ কাজ-কর্ম পাওয়া যায়। মানুষের মাঝে ক্রোধ আছে। জন্তু-জানোয়ারও রাগান্বিত হয়। মানুষ ভালবাসে। জন্তু-জানোয়ারও আদর করে। এখন আমি এথেকে আরও নিম্নস্তরের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি অর্থাৎ গাছ-পালার দৃষ্টান্ত। এদের মাঝেও আমরা এমন কার্য-কলাপ দেখে থাকি যা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অবশ্য এতে পার্থক্য রয়েছে। গাছ-পালার মাঝে এ কার্য-কলাপ খুবই নগণ্য মানের পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেভাবে মানুষের মাঝে আদান-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তেমনিভাবে গাছ-পালার মাঝেও রয়েছে। আজকাল নতুন গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে, প্রায় সব গাছ-পালার মাঝে নর-নারী আছে (যদিও কুরআন করীমে এ বিষয়ে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে)। আর যখন নর-নারী মিলিত হয় তখন ফল ধরে। খেজুরের ব্যাপারে একথা হাজার হাজার বছর আগে জানা ছিলো। জানা যায়, গাছ-পালার মাঝে সঙ্গম-প্রথা মজুদ আছে। আবার তাদের মাঝে ক্রোধের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জানা যায়। ডাঃ বোস (স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু-অনুবাদক) যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে লজ্জাবতী গাছকে দেখো। আঙ্গুলের স্পর্শের সাথে সাথে পাতাগুলো মুদে যায়। এর ফলে যদি হাত লাগানো যায় তাহলে নিজের অভ্যন্তরস্থ বীজ বাইরে নিক্ষেপ করত তা মুদে যায়। আমেরিকায় একটি গাছ আছে। মাংসের শরীর সম্বলিত যদি কোন কিছু-এর নিকটে যায় তাহলে উল্লসিত হয়ে ছড়িয়ে যায়। আর সেই জিনিস যদি তার গায়ে লেগে যায় তাহলে তা মুদে

যায় আর এর রক্ত পান করে একে নিক্ষেপ করে। এ ধরনের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয়, গাছ-পালার মাঝেও এ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়।

এখন আমরা আরও নিম্ন স্তরের (জিনিসের) দিকে তাকাচ্ছি এবং জড় পদার্থকে নিচ্ছি। বলা হয় মানুষের মাঝে ভালবাসা একটি অতি উচ্চ গুণ। কিন্তু ভালবাসা কী জিনিস? ভালবাসা বলতে নিজের দিকে আকৃষ্ট করাকে বুঝায়। তাহলে পরে চুম্বক কি লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে না? এর মাঝে এই আবেগ রয়েছে; কিন্তু খুবই সাদা-সিদা আবেগ। এর তুলনায় বিদ্যুতের একই রকম শক্তি দু'টি বস্তুর মাঝে যদি সৃষ্টি করে দেয়া যায় তাহলে উভয় বস্তুই একে অপরকে বিকর্ষণ করবে যেন একে অপরকে ঘৃণা করছে। অতএব এটা প্রমাণিত হয়ে গেল, ভালবাসা ও আকর্ষণ এবং ঘৃণা ও ক্রোধের উপকরণ জড় পদার্থের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়।

আবার আমি বলেছি, এসব শক্তি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুর মাঝেও মজুদ রয়েছে। এদের মাঝে যদি এসব শক্তি না থাকতো তাহলে পৃথিবী সৃষ্টিই হতে পারতো না। অণুগুলো একে অপরকে যদি আপসে আকর্ষণের মাধ্যমে একত্র না হতো তাহলে কোন বস্তুর পৃথিবীতে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে যেতো। এটা আকর্ষণ করার শক্তি ছাড়া কিছু নয়। এটা অণুগুলোকে আপসে সংবদ্ধ করে রাখছে। অতএব প্রমাণিত হলো, চরিত্রের মূল খুব গভীরে অবস্থিত। যদিও এটা ঠিক, আমরা যতই নিম্ন শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য করি ততই আমরা কয়েকটি চরিত্রের সন্ধান পাই আর কয়েকটির সন্ধান পাইও না। কিন্তু সব স্থানে মূলের অবস্থিতি যে মজুদ আছে এতেও সন্দেহ নেই।

যেসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ ঘটে তা অণু-পরমাণুর বিশ্বেও পরিদৃষ্ট হয়– এ বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণিত করে দেবার পর এখন আমি চারিত্রিক মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছি। মনে রাখা উচিত, মৌলিক পদার্থের প্রাথমিক অবস্থার ওপর চিন্তা করলে জানা যায়, যেভাবে মৌলিক পদার্থের ছ'টি দিক (Dimension) রয়েছে অর্থাৎ ওপরে নিচে, ডানে বামে ও সম্মুখে পশ্চাতে। এভাবে ছয়টি অভ্যন্তরীণ দিকও রয়েছে আর এগুলো নিজের তুলনার দিক থেকে এভাবে জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে যেভাবে বাহ্যিক দিকগুলো জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করছে। অর্থাৎ যেভাবে বাহ্যিক দিক থেকে একের তুলনায় অন্য দিক যেমন, ডান হয়ে থাকলে অন্যের তুলনায় বাম। এক তুলনায় সম্মুখ হয়ে থাকলে অন্য তুলনায় পিছন। এক তুলনায় ওপর হয়ে থাকলে অন্য তুলনায় নিচ হয়ে থাকে। এমনিভাবে অভ্যন্তরীণ দিকও তুলনামূলকভাবে ছ' ছ' প্রকার হয়ে থাকে যেমন, নর-নারী সম্বন্ধীয়– অন্যের ওপর নিজ প্রভাব সৃষ্টিকারী

এবং অন্যের কাছ থেকে প্রভাব গ্রহণকারী। যা প্রভাব গ্রহণ করত পারে না সেই বস্তুর ওপর যে কোন প্রভাব পড়তে পারে না এটা সুস্পষ্ট কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ আটা নরম হয়ে থাকে এর মধ্যে মুষ্ঠি ঢুকে যায় কিন্তু টেবিলে ঢুকতে পারে না। কেননা, এটা ওটার প্রভাব গ্রহণ করে না।

এথেকে জানা গেলো, তখনই কোন কাজ হতে পারে যখন এক দিকে কাজ করার সামর্থ্য ও অন্য দিকে প্রভাব গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকে। প্রত্যেক অণু যার অস্তিত্ব জানা গেছে এতে আকর্ষণ করার ও আকর্ষিত হওয়ায় শক্তি আছে।

প্রথমত **অভ্যন্তরীণ দিকগুলোর আকর্ষণ করার শক্তি আছে** আর এর সাথে ঝুঁকার শক্তি থাকলে প্রয়োজনীয় জিনিষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তা আকর্ষণ করতে থাকবে বা অন্য দিকে ঝুঁকে যেতে থাকবে। এভাবে **দ্বিতীয় দিক হলো বির্কষণ করা** এবং এর সাথে অন্য শক্তি হলো এড়িয়ে চলা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো **প্রতিটি অণুর বিলীন হওয়া**। প্রত্যেক বস্তু যা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে অন্য জিনিষকে বিলীন করে দেয়। যেমন, আমি আমার হাত এখান থেকে উঠিয়ে ওখানে রাখলে পরে প্রথম হাত রাখা যে আকৃতি ধারণ করেছিলো তা বিলীন করে অন্য রকম করা হয়েছে। এমনিভাবে অণুগুলো যখন প্রভাব গ্রহণ করে নতুন আকৃতি ধারণ করে তখন প্রথম অবস্থার ওপর লয়ের অবস্থা আরোপিত হয়ে থাকে। এর মাঝে লয়-প্রাপ্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য নিহিত অর্থাৎ প্রতিটি অণুতে যেখানে অন্যকে বিনাশ করার যোগ্যতা আছে সেখানে স্বয়ং এতে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতাও আছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো **স্থায়ীত্ব**। কোন বস্তু পতিত হওয়ার পূর্বে দেয়াল থাকলে তা ঠেকানোর কাজ করবে। এটা স্থায়ী থাকার শক্তি। নিহিত বৈশিষ্ট্য হলো বাকা বা স্থায়ীত্ব অর্থাৎ স্থায়ী থাকার যোগ্যতা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো **বিকাশ লাভ** অর্থাৎ কোন কোন বস্তু সম্মুখে নিয়ে আসা, প্রকাশ করা। প্রত্যেকটি অণু অন্যটিকে সামনে এগিয়ে দেয়। একে স্থুল ও প্রকাশমান করে দেয়। এতে বিকশিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রতিটি অণুর মাঝে বিকশিত হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো **গুপ্ত হওয়া** অর্থাৎ কোন বস্তুকে বিলুপ্ত করে দেয়া। যেমন আমার হাতের পিছনে যদি কোন বস্তু থাকে তখন এটা তা লুকিয়ে ফেলবে। এতে গুপ্ত হওয়া বা লুকানোর শক্তি নিহিত আছে। অর্থাৎ নিজ সত্তাকে গুপ্ত করে দেয়া বা অন্যের ছায়ায় অবস্থান নেয়া।

এসব শক্তি যা জড় পদার্থের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অংশে পাওয়া যায় তা আখলাক ও চরিত্রের ভিত্তি। সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি এগুলোর ওপর আর

এটাই উন্নতি করতে করতে মানুষের মাঝে এক বিস্ময়কর আকৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকে। জড় পদার্থ যতটুকু মিশ্রিত হতে থাকে অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো মিশে যেতে থাকে। এর কর্মসমূহে আধিক্য ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়ে যেতে থাকে। জড় পদার্থ যতটা উন্নতি করে থাকে এসব বৈশিষ্ট্য উন্নত রীতিতে ও বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং যতই নগণ্য হয়ে যেতে থাকে এসব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নগণ্য ও সীমাবদ্ধ হতে থাকে। যতক্ষণ অকৃত্রিম জড় পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে ততক্ষণ আমরা এসবের প্রকাশকে ভাল ও মন্দ তো বলতে পারি; কিন্তু উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা খারাপ বলতে পারি না। যেভাবে আমরা প্রত্যেক বস্তু যা কাজ দেয় না আমরা একে খারাপ এবং যা কাজ দেয় একে ভাল বলতে আরম্ভ করি। আর এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, এ দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এদের মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে বা হচ্ছে না। দেখো, এই যে লাঠি এটা কারও গায়ে গিয়ে যদি পড়ে তাহলে এটা তার নিকট খারাপ বলে মনে হবে কিন্তু এটা বলবে না যে, এটা এই লাঠির অপকর্ম। এভাবে যদি কেউ কোথাও একটি পরিত্যক্ত পয়সা পায় তাহলে সে বলবে ভালই হলো; কিন্তু এটা বলবে না যে, এটা পয়সার অনুকম্পা। সুতরাং কর্ম যখন জড় পদার্থের বিকাশ হিসেবে সংঘটিত হয় তখন আমরা ভাল কিংবা মন্দ বলতে তো পারি; কিন্তু চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি না। ভাল বা মন্দ বলার অর্থ এই, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সে কাজ করছে বা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

কখনও কখনও ভাল বা মন্দ আপেক্ষিক রূপ ধারণ করে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তির গুলি লাগলো তখন যে তার বন্ধুভাবাপন্ন হবে সে বলবে, খারাপ কাজ হয়েছে। কিন্তু বিরোধী হলে সে বলবে, ভাল কাজ হয়েছে। এটাই হলো ভাল বা মন্দের আপেক্ষিক রূপ। আমরা একে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি না। এ স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ বটে যা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হচ্ছে। ইচ্ছার যেহেতু সংমিশ্রণ নেই এজন্যে একে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বলি না। কিন্তু কাজ এক রকমেরই।

অবশ্য যখন উন্নতি করতে করতে মূল পদার্থ মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করে তখন এ ৬টি বৈশিষ্ট্য শ' শ' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। যেহেতু মূল পদার্থকে পর্যায়ক্রমে মিশ্রণের পরে মানব সৃষ্টি হয়েছে এসব বৈশিষ্ট্যও এতে পর্যায়ক্রমে মিশ্রিত হতে থেকেছে। রং হলো এর দৃষ্টান্ত। এ আসলে তো কেবল ৬/৭ প্রকারের; কিন্তু একে মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় শত শত রং তৈরী করে নেয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষের মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নব নব রূপে হতে থাকে- একে 'খুল্‌ক'(প্রকৃতি, গুণ বা স্বভাব) বলা হয়। যেন এ একটি নতুন সৃষ্টি আর 'খুল্‌ক'

অর্থাৎ দৈহিক সৃষ্টি থেকে পার্থক্য করার জন্যে 'পেশ' ব্যবহার করে 'খুলক' হিসেবে বলা হয়। নচেৎ আসলে এতে ৬টি বৈশিষ্ট্যই নিহিত যা প্রাথমিক কাল থেকে মূল বস্তুতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যতক্ষণ তা জড় পদার্থে ক্রিয়াশীল থাকে একে বলা হয় শক্তি। যখন বৃক্ষ-লতাদিতে একটু অপেক্ষাকৃত পূর্ণাকারে বিকশিত হয় তখন একে বলা হয় অনুভূতি। যখন জীব-জন্তুর মাঝে এথেকে পূর্ণাকারে বিকাশ লাভ করে তখন একে কাম-প্রবৃত্তি বা প্রাকৃতিক চাহিদা বলা হয়। এবং যখন এথেকেও পরিপূর্ণ আকারে মানবের মাঝে বিকশিত হয় তখন চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এর বিকাশকে প্রাকৃতিক চাহিদা বা প্রাকৃতিক বিকাশ বলা হয়। আর যখন চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে এর বিকাশ ঘটে তখন একে 'খুল্‌ক' বলে অর্থাৎ বলা হয় উন্নতির চরম মার্গে পৌছে গেছে। যেভাবে কুরআন করীমে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে এসেছেঃ

'আর আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাষ থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমরা একে সংস্থাপন করি শুক্র-বিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানে। পরে সেই শুক্র-বিন্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্ত-পিণ্ডে পরিণত করলাম। এরপর সেই আঁঠালো জমাট রক্ত-পিন্ডকে (আকৃতি বিহীন) মাংস-পিণ্ডে পরিণত করলাম। আবার সেই মাংস-পিন্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করলাম। এরপর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করলাম, এরপর একে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করলাম। সুতরাং অতি কল্যাণময় সেই আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী (সূরাতুল মু'মিনূন ঃ ১৩-১৫)। মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলা সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত করলেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এর অধীনস্থ করে দিলেন।

এখন এ মূলনীতিকে বুঝে নেবার পরে মানবীয় আচার-আচরণের ওপর চিন্তা করো। সব আচার-আচরণের উৎপত্তিস্থল এ সাদা-সিদা বৈশিষ্ট্য যা মূল বস্তুতে নিহিত বলে পরিদৃষ্ট হয়। এটা বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর এ কারণে আমরা কোন পর্যায়কে মন্দ বলতে পারি না। কেননা, তা প্রাকৃতিক চাহিদা। আমরা একে তখনই খারাপ বলে অভিহিত করতে পারি, যখন এটা অসময়ে ব্যবহৃত হয় যেমন, হীনমন্যতা। সবাই একে মন্দ বলে। কিন্তু এর কি এ উদ্দেশ্য নয় যে, একটি বিষয় থেকে মানুষ পশ্চাদমুখী হয়। অথচ কেবল পেছনে সরে যাওয়াকে খারাপ বলা যেতে পারে না। এটা এড়িয়ে চলার প্রাকৃতিক আবেগের প্রকাশ মাত্র। আমরা একে তখনই খারাপ আখ্যা দিব যখন এ কর্ম বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদার পরিপন্থী করা হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সংসারের প্রতি উদাসীন সন্ন্যাসীদের প্রতি লক্ষ্য করি তখন তা-ও আসলে পেছনে সরে যাওয়ার কর্ম। কিন্তু সবাই ওটা ভাল বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যদিও

উভয়ের কর্মের আকৃতি একই তবুও সত্য কথা এটাই, এ কর্মও নিজ সত্তায় ভালও নয় মন্দও নয়। বরং যখন বুদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী এ কর্ম সংঘটিত হয় তখন এটা উত্তম নচেৎ মন্দ; এর নাম সংসারের প্রতি উদাসীনতা রাখ বা অন্য কিছু। এভাবে ধৈর্যের কথা বলা যায়। এর মাঝেও এড়িয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। আর আমরা একে তখনই উত্তম বলবো যখন এটা বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়, নচেৎ বলবো না।

এখন আমি বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্তের সম্বন্ধে বলছি আর তা হলো প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ সেই ভালবাসার যা স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ; একজন শিষ্য নিজের পীরের সাথে বা ছাত্র তার শিক্ষকের সাথে যেমন ভালবাসা পোষণ করে থাকে। সে তার সৌন্দর্য দেখে স্বীয় অভ্যন্তরে আকর্ষণ-শক্তি বহন করে ফলে তার দিকে ঝুঁকে যায়। যখন এ ভালবাসা বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদা মোতাবেক হয়ে থাকে তা উত্তম স্বভাব বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর যখন এটা হয় না তখন তা লাম্পট্য ও হীনমন্যতা; কিন্তু উভয় অবস্থার মাঝে একই বাস্তবতা নিহিত থাকে। আর প্রকৃতিতে নিহিত অন্যের আকর্ষণকে গ্রহণ করে নেবার সে বৈশিষ্ট্যই অন্য এক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিরোধের শক্তি থেকে উদ্ভুত আচার-আচরণের দৃষ্টান্তে সাহসিকতাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সাহসিকতা কী জিনিস? প্রকৃতিতে নিহিত প্রতিরোধের সেই বৈশিষ্ট্যই, এই আকারে বিকশিত হয়। আবার যখন যথাযোগ্য সুযোগে এর ব্যবহার করা হয় তখন একে উত্তম গুণ আখ্যায়িত করা হয় নচেৎ অপগুণ। গালি দেবার অভ্যাসও এ রকম বৈশিষ্ট্যের একটি শাখা। এর উদ্দেশ্যও অন্যের অভিযোগ বা আক্রমণ অথবা নির্যাতনকে নিজের চেষ্টায় অপসারণ করা।

আকর্ষণ-শক্তির একটি বিকাশ রয়েছে। আকর্ষণী বস্তু অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ প্রকৃতি যখন মানবীয় লালসারূপ কর্মকান্ডে প্রকাশ পায় তখন কখনও কখনও লালসার আকারে ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানকে আকর্ষণ করতে ব্যাপৃত হয়। আর যখন অবৈধভাবে প্রকাশিত হয় তখন একে খারাপ নচেৎ ভাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমন আচরণের মাধ্যমে প্রফুল্লতা অর্থাৎ সদাচরণের সাথে সাক্ষাৎ করাও আর প্রশংসা ও প্রেমাস্পদের ভালবাসা এবং ধর্ম-নিষ্ঠা ও সত্যের প্রচারের জন্য বিতর্ক করার গুণও এরূপ আবেগের অধীন।

বিলীন হওয়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্ট আচার-আচরণের দৃষ্টান্তে বীরত্বকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বীরত্ব সেই আবেগকে বলা হয় যাতে মানুষ নিজ বিলীনতার সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং বলে, আমি আমার জীবনের মোটেও পরওয়া করবো না। এ আবেগও কখনও বুদ্ধির অধীন হয়ে থাকে। এ

সময়ে এ আবেগ খুবই উন্নত পর্যায়ে থাকে যেভাবে নেয়ামতুল্লাহ্ খান করেছেন। প্রাণ উৎসর্গ করার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন; কিন্তু ঈমানের সুরক্ষা করেছেন। যখন বুদ্ধির সাথে সঠিক পন্থায় এর ব্যবহার করা হয় তখন একে বলা হয় কুরবানী বা উৎসর্গ; কিন্তু যখন বুদ্ধির মাধ্যমে হয় না-যেভাবে আগুন জ্বলছে আর কেউ তাতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিজে ভস্মিভূত করে তখন এটা বীরত্ব কিন্তু বুদ্ধির সাথে করা হয় নি বিধায় এটা মন্দাচরণ।

এ আবেগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো ইহ্সান বা অনুগ্রহ। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অন্যের খাতিরে নিজের অধিকারকে প্রত্যাহার করে এবং এক সীমা পর্যন্ত নিজের বিনাশ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করে। যেহেতু সে এসব জিনিস যা তাকে কর্মক্ষম করার জন্যে ছিলো, তা অন্যকে দিয়ে দেয়।

বিলীন ও মরণশীল হওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্ট আচার-আচরণের দৃষ্টান্তের মাঝে হত্যা, বিলোপ সাধন ও হিংসাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এসব আচার-আচরণের গভীরে বিলীন হওয়ার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত শক্তির প্রাবল্য প্রতীয়মান হয়।

স্থায়ীত্বের প্রকৃতির গভীরে সৃষ্ট আচার-আচরণের দৃষ্টান্তে বদান্যতা, আশা, অনুগ্রহ এবং এ ধরনের আচার-আচরণকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। (অনুগ্রহকে আগে বিলীনতার অধীন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর কারণ এই, কোন কোন আচার-আচরণ মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং দু'টি প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আবেগাদির প্রকাশ করে থাকে)।

অহংকার অর্থ অন্যদেরকে পেছনে ফেলে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা। সাহসিকতা, নিজ মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, বিকাশের প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, এদের মাঝে প্রকাশিত হওয়ার বাসনা সুপ্ত রয়েছে।

গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, লোক দেখানো কাজ, লজ্জাহীনতা, সত্যবাদিতা-এমন আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো প্রকাশিত হওয়ার প্রবণতা বহন করে থাকে।

ভরসা, অমনোযোগিতা ও লজ্জার আচার-আচরণ লুপ্ত হওয়ার শক্তি অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মূল-বস্তু থেকে উন্নতি করে সৃষ্টি হয়েছে।

উপহাস, আনন্দ, মিথ্যে সাক্ষ্য, বিশ্বস্ততা, মিথ্যা, গোপনীয়তার স্বভাবের প্রবণতা থেকে উদ্ভুত বলে মনে হয়।

কোন কোন আচার-আচরণ মিশ্রিত হয়ে থাকে। যেমন, হিংসা। আকর্ষণও বিলীনতার সাথে মিশ্রিত আর এড়িয়ে যাওয়াও বিলীনতার সাথে মিশ্রিত।

কোন কোন আচার-আচরণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্বভাবের অধীনে সৃষ্ট হয়ে থাকে। যেভাবে সাহস করা ও ঝগড়া করা কখনও বিরক্তি বোধ থেকে সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অন্যের দাবীকে ব্যর্থ করে দেয়া। কখনও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সাহস ও ঝগড়ার প্রকাশ ঘটে থাকে। তখন শোষণের স্বভাবের অভিব্যক্তি ঘটে।

মোটকথা মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে জানা যায়, তা আসলে স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি উন্নত আকৃতি এবং কেবল বিবর্তনের অবস্থায় অনুভূতির আকার ধারণ করে গেছে। আর কোন কোন আকারে মিশ্রিত হয়ে গেছে। এ নীতির অধীনে যা আমি ওপরে বর্ণনা করেছি, সেগুলো দিয়ে কেবল চরিত্রের মূল ও তাৎপর্যই জানা যায় না বরং এথেকে অধিক এই লাভও হয়, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যায় যে, চরিত্রের ভাল ও মন্দ এর মাঝে নিহিত নয় বরং ওগুলোর প্রয়োগের ধরন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক রাখে। কেননা, স্বভাব নিজ সত্তায় ভালও নয়, মন্দও নয়। কিন্তু গবেষণা দ্বারা এথেকে বেশি সাব্যস্ত হয় যে, বিশ্বকে সৃষ্টি করার জন্যে একটি সত্তা অবশ্যই রয়েছেন। কেননা, চরিত্রের এমন গভীর শিকড় আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে পারতো না। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, প্রাথমিককাল থেকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, মানুষের অন্তরে উত্তম চরিত্রের একটি গভীর শিকড় প্রতিষ্ঠা করা হয় যাথেকে সে মুক্ত হতেই পারে না। কোন ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন সত্তা ছাড়া এ ক্রিয়া প্রকাশ হতে পারে না। তিনিই মানবের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে এর উপাদানে উত্তম চরিত্র মিশ্রিত করেছেন যেন সে সর্বাবস্থায় ও বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে চরিত্রের প্রভাবকে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে এবং এর দিকে তার স্বাভাবিক মনোযোগ নিবন্ধ হয়।

উত্তম চরিত্রের প্রতি কেন দৃষ্টি রাখা হবে?

চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই, কেন উত্তম চরিত্রের বহির্প্রকাশ ঘটাতে হবে আর মন্দ চরিত্র কেন পরিহার করতে হবে?

ইউরোপের লোকেরা যেহেতু দার্শনিক বিষয়াদির দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়ে থাকে তাই তারা এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তাদের মাঝ থেকে বড় বড় গবেষক খুবই চিন্তা-ভাবনা করে এ প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন, উত্তম চরিত্র নিজ সত্তায় খুবই ভাল। এ জন্যে উত্তম চরিত্রের খাতিরে, অন্য কোন উদ্দশ্যকে সামনে না রেখে নিজে তা গ্রহণ করা উচিত।

ইসলামের চরিত্র বিশেষজ্ঞগণ এ প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন, মানুষকে পুণ্যের নিয়্যতে উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটানো দরকার। আর ইমাম গায্যালী

(রঃ) তো এ পর্যন্ত বলেন, কেউ স্বাস্থ্য হানির কারণে যদি ব্যভিচার পরিহার করে তাহলে সে মুত্তাকী নয় (বরং পুণ্যের খাতিরে তা পরিহার করা আবশ্যক –অনুবাদক)।

এ ধারণার ওপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবক্তাগণ দু'টি আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন ঃ

১। যে-ব্যক্তি কোন রোগীর চিকিৎসা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে করায় না বরং পুণ্যের খাতিরে করায় সে কি ব্যবসায়ী নয়? আবার যে-ব্যক্তি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে এসব কাজ করে থাকে তাকে কেন ভাল মনে করা হয়।

২। কোন ব্যক্তি নিজের সম্মান ও স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে যদি ব্যভিচার পরিহার করে সেক্ষেত্রে সে কেন সাধু নয়? আর যদি সাধুতা না হয় তাহলে শরীয়ত ব্যভিচারকে কেন নিষেধ করেছে? তোমরা বলছো, যেহেতু এভাবে ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়াটা পুণ্যের নিয়্যতে হয় নি তাই একে উত্তম চরিত্র আখ্যায়িত করা যায় না। আমাদের জিজ্ঞাস্য, খোদা কোন কাজে কেন পুণ্য দান করেন? যে কাজের ব্যাপারে তিনি বলেন, এ কাজ করো না তখন তা করা হয়। আর যে কাজের ব্যাপারে তিনি বলেন, কর তা করা হয় না এ জন্যে নয়। এখন প্রশ্ন উঠে, কেন তিনি কোন কাজের ব্যাপারে বলেন, এটা করো এবং কেন বলেন, অমুক কাজ করো না। কোন প্রজ্ঞা ছাড়া যদি বলা হয় তাহলে তাঁর শরীয়ত অর্থহীন-অযথা প্রতিপন্ন হয়। আর কোন কারণে ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে যদি করা হয় তাহলে সে প্রজ্ঞাকে দৃষ্টিপটে রেখে সে কাজ করা কেন উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না? যে প্রজ্ঞাকে খোদাতাআলা আদেশ দেয়ার সময়ে দৃষ্টিপটে রাখেন বান্দা কাজ করার সময় তা যদি দৃষ্টিপটে রাখে তাহলে তার কাজের মর্যাদা কেন কম হবে? যেমন, খোদাতাআলা স্বাস্থ্য রক্ষা বা শান্তি রক্ষার খাতিরে ব্যভিচারকে নিষেধ করেন তাই যখন আমরা সে উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকি তাহলে কেন একে উত্তম চরিত্র মনে করা হবে না আর আমরা কেনইবা পুণ্যের অধিকারী হবো না? আর ব্যভিচার থেকে নিষেধ করার কোন উপকারই যদি না থাকে তাহলে বুঝা গেল, খোদাতাআলা এর নিষেধাজ্ঞা এমনি এমনি দিয়েছেন।

প্রথম আপত্তি অর্থাৎ ব্যবসায়ের জবাব এই, এ কাজ আর এ ব্যবসায়ের মাঝে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কেননা, উত্তম চরিত্রের অংশ খোদাতাআলা পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত করে রেখেছেন আর বলে দিয়েছেন, যে-ব্যক্তি অমুক কাজ পরিহার করবে তাকে এ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব এটা ব্যবসায় নয় বরং পুরস্কার। কেননা, ব্যবসায়ে মানুষ নিজের কাজের মূল্য স্বয়ং নির্ধারিত

করে থাকে। এখানে বদলার বিষয়টি তার জন্মেরও পূর্বের নির্ধারিত বিষয় এবং প্রাকৃতিক বদলা। আমরা স্বয়ং খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত রাখি বা না রাখি তবুও বদলা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং পেতে থাকবো। সুতরাং এটা ব্যবসায় নয়। ব্যবসায় তো এই, যেমন ধরুন এক ব্যক্তির নিকট ঘি আছে এবং অন্যের নিকট অর্থ। সে অর্থ দিয়ে ঘি কিনে নেয়। কিন্তু বিক্রেতা স্বাধীন। হয় সে নিজের জিনিস দেবে কিংবা না দেবে। কিন্তু এখানে বিষয়টি অন্য রকম। কেননা, কাজ যিনি নেন তিনি স্বয়ং পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কর্মী তার নিকট কোন দাবী পেশ করে নি। আবার পার্থক্য এই, প্রতিশ্রুতি দাতা স্বয়ং তিনি। আসলে আমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী। সেই কাজ যা আমরা পুণ্যের নিয়্যতে করে থাকি যদি না-ও হয় তবুও তাঁর অনুগ্রহ লাভ করি। এটা এমন এক ব্যক্তির পুরস্কার যাঁর পুরস্কার ছাড়া আমরা জীবিতই থাকতে পারি না। একে ব্যবসায় বলা যায় না। ব্যবসায় তার সাথে হতে পারে যার মাধ্যমে আমরা ধনবান হই, তার সাথে সম্পর্ক রাখি বা না রাখি।

দ্বিতীয় অভিযোগ একেবারে ঠিক আছে। কেবল শর্ত এই বলা হয়, পুণ্যের নিয়্যতে করা না হলে তা সচ্চরিত্র থেকে উদ্ভুত নয়। এসব অভিযোগের আসল জবাব এই, তোমরা পুণ্যের মাহাত্ম্যকে বুঝতে পার নি। পুণ্যের উদ্দেশ্য যদি টাকা-পয়সা হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তোমাদের অভিযোগ যথার্থ হতে পারে। কিন্তু পুণ্যের অর্থ টাকা-কড়ি নয়। বরং সে উচ্চ উদ্দেশ্য লাভ করা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্য এই, আমরা যেন পরিপূর্ণ গুণাবলীতে মন্ডিত হই। আমাদের মাঝে সেই শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যদ্দারা পবিত্রতা আমাদের সত্তার মণি-মুক্তোতে পরিণত হয় এবং আমরা পবিত্রতার প্রস্রবণে পরিণত হই। যেসব কল্যাণ বাহ্যত জড় মনে হয়, ওগুলো হয়ত রূপক নয়তো বা আসল উদ্দেশ্য নয় বরং আনুসঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর আনুসঙ্গিক বিষয় আসল উদ্দেশ্য নয়। মানুষ একজন বন্ধুকে খাতির করে থাকে। সেই খাতির আসল নয় বরং আনুসঙ্গিক। আসল আন্তরিক সম্পর্ক ও অভ্যন্তরীণ নৈকট্য। এভাবেই পুণ্য দিয়ে খাওয়া বা পরা বুঝায় না বরং সত্তার পরিপূর্ণতা লাভ বুঝায়। যেভাবে কুরআন করীমে এসেছে, আমি জিন্ন ও ইনসানকে কেবল আমার উপাসনার জন্যেই সৃষ্টি করেছি (৫১:৫৭)। সুতরাং পুণ্য কর্ম এটাই যেন মানুষের খোদার দাস হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সে উৎকর্ষ লাভ করে। আর এতে কী সন্দেহ, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করাতেই চরিত্র সচ্চরিত্র আখ্যায়িত হতে পারে। তা না হলে তা লোক দেখানো অনুশীলন ছাড়া আর কিছু নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে-ব্যক্তি বাহ্যিক আচার-আচরণ অনুযায়ী কাজ করবে সে পৃথিবীতে এক সীমা পর্যন্ত উপকৃত হবে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাথে সাথে যদি

উৎকর্ষ লাভ না করার হয় এবং খোদার সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে উৎসাহিত না হয় তাহলে উৎকর্ষ কিভাবে তার লাভ হবে? আন্তরিক ও মেধাগত কর্মের কেন্দ্র-বিন্দু তো নিয়্যত ও সংকল্পের ওপরে খুবই নির্ভরশীল। আমরা তো দেখে থাকি, দৈহিক কর্মও নিয়্যতের সাথে সম্পর্কিত। ব্যায়াম করার সময় দেহের শক্তির কথা মনে রাখলে উত্তম ফল সৃষ্টি হতে পারে আর যদি না রাখা হয় তাহলে তো তা হবে তুচ্ছ।

দ্বিতীয় জবাব এই, আমরা ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে নৈতিকতা অবলম্বন করে থাকি এবং ঐশী সন্তুষ্টি লাভের অর্থ এই নয়, খোদাতাআলা ভবিষ্যতে আমাদের কিছু দিবেন বরং তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত ও কল্যাণের জন্যে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর উত্তম নৈতিকতার ভিত্তিতে তাঁর সমীপে সফলকাম হিসেবে গণ্য হই।

এছাড়াও আমি বলি, অভিযোগকারী স্বয়ং নিজের কথার অর্থ বুঝেন নি। পুরস্কার লাভে যদি স্বার্থপরতা নিহিত থাকে তাহলে তার মাঝেও স্বার্থপরতা নিহিত আছে। আমরা তার নিকট প্রশ্ন রাখি, কোন ব্যক্তি কেন রোগের চিকিৎসা করে? সে যদি বলে, আন্তরিক কৃপার কারণে তাহলে পরে এটা প্রশংসনীয় নয়। কেননা, এটা অন্তরকে যদি বাধ্য করে, সত্বর চিকিৎসা কর তাহলেও চিকিৎসকের এটা বৈশিষ্ট্য নয় যে, তিনি নিজের অন্তরের তাগিদে বাধ্য হয়ে করছেন। এটা না হলে আরো কোন কারণ হয়ে থাকবে। আর তা হলো সহযোগিতার মানসিকতা। মানুষ বুঝে, আজ আমি কারও চিকিৎসা করলে তো কাল কেউ আমারও করবে। এতেও এ কাজের বদলা লাভের ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। এর মোকাবেলায় আমাদের প্রতি দেখ, আমরা যে কাজ করি এর-বিনিময়ে ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা লাভ হবে আমরা এ নিয়্যত রাখি না। বরং ইতঃপূর্বে খোদার নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের আমরা শোকরিয়া আদায়ের নিয়্যতে করি।

সচ্চরিত্রবান কাকে বলে?

সচ্চরিত্রবান কাকে বলে এখন আমি সে বিষয়ে আলোকপাত করবো। খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে শারীরিক গঠন সর্বসুন্দর হলে এবং সর্বক্রুটিমুক্ত হলে তাকে সচ্চরিত্রবান বলা হয়। অবশিষ্ট ধর্মের লোকেরাও কম বেশি একই কথা বলে থাকে। কিন্তু ইসলাম বলে-'যার পুণ্য অধিক হয় সে সচ্চরিত্রবান এবং যার পাপ অধিক হয় সে অসচ্চরিত্রবান' (১০১ঃ৭-১০)। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন পুণ্য কর্ম করতে থাকে এবং একটি পাপ মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে অসচ্চরিত্রবান হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, যে ব্যক্তি চেষ্টা-প্রচেষ্টা

দ্বারা অধিক সংখ্যায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে নেয় এর মাঝে যদি কোন ক্রটিও থাকে যাকে সৌন্দর্য আচ্ছাদিত করে দেয় তাহলে সে-ও সচ্চরিত্রবান।

আসল কথা এই, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা মনে করে শরীয়ত বা বিধান স্বেচ্ছাচারী। এর আদেশাবলীর কোন কারণ নেই। এ জন্যে সামান্য কোন আদেশ লঙ্ঘিত হলে মানুষ পাকড়াও হয়ে যায় যেন শরীয়ত শাস্তি দেবার জন্যেই সৃষ্ট। কিন্তু ইসলাম বলে, সচ্চরিত্র ও শরীয়তের আদেশসমূহ নিজ সত্তায় কোন উদ্দেশ্য বহন করে না বরং এর অনুশীলনই মানুষের অন্তরে পবিত্রতা সৃষ্টি করার জন্যে অবস্থান করে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ করানো হয়ে থাকে যেন পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। এ জন্যে কোন প্রশিক্ষণে যদি কোন প্রকার ক্রটি হয়ে যায় তাহলে এর জন্যে শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক নয়, সেই সময় ক্রটিজনিত প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় আর আসল উদ্দেশ্যে যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হয়ে যায়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ স্কুলে কোন ছাত্র যদি ১০টি প্রশ্নের একটির সঠিক উত্তর না দেয় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হয় না। এভাবে ডাক্তারও ভুল করে থাকেন; কিন্তু তার চিকিৎসায় রোগ যদি ভাল হয় তাহলে তাকে ডাক্তার মনে করা হয়। সুতরাং কারও মাঝে দুর্বলতা যদি থেকেও যায় তবুও তাকে সচ্চরিত্রবান মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এর এই উদ্দেশ্য নয় যে, কেউ বলে, অন্য কোন মন্দ কাজ করবো না কেবল চুরি করবো। একটি দুর্বলতায় তো কিছু যায় আসে না। এটা বিদ্রোহিতার সামিল আর বিদ্রোহিতার ক্ষমা নেই। ভুল-ক্রটির ক্ষমা হয়ে থাকে। যেমন একজন ছাত্র বলে, আমি একটি প্রশ্নের জবাব দিব না তখন তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, সে পরীক্ষককে অবমাননা করেছে। কিন্তু সে যদি এক আধটি প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে তাহলে এ কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

চরিত্রের সংশোধন কি সম্ভব ?

এখন একটি প্রশ্ন উঠে, চরিত্রের সংশোধনও কি সম্ভব? যদিও সাধারণভাবে লোকেরা বলে, সম্ভব; কিন্তু নিজেদের ব্যাপারটি যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বলে দেয়, কিছুই হয় না। এ লোক সমাগমে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, চরিত্র কি সংশোধন হতে পারে? তখন বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে। আর যদি বলো, তোমরা কি নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছ? তখন বলবে, আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই হয় নি। সাধারণভাবে তো এই হয়ে থাকে যে, লোক অন্যের বেলায় খারাপ মন্তব্য করে থাকে এবং নিজের জন্যে ভাল। কিন্তু এ ব্যাপারে উল্টো হয়ে থাকে। কেননা, তারা অন্য লোকদের বেলায় ভাল মতামত প্রকাশ করে থাকে আর নিজের ব্যাপারে মন্দ। কিন্তু কুরআন করীম বলে, চরিত্রের

সংশোধন হতে পারে। কুরআন বলে, *ফাযাক্কির ইন্নাফাআতিয্ যিক্‌রা* (৮৭ঃ১০)। 'ইন'-এর অর্থ হলো 'ক্বদ'। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)! তুমি লোকদেরকে উপদেশ দাও, উপদেশ সর্বদাই উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। অতএব কুরআন করীমের এ আয়াতের মাধ্যমে চরিত্রের সংশোধন সব অবস্থায়ই হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ ব্যাপারে জামাতকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিজ সত্তায় একটি অলৌকিক ব্যাপার; বরং এত বড় অলৌকিক ব্যাপার যে, এটাই তাঁর সত্যতার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কুরআন করীম [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জ্ঞানের ভিত্তি] ছাড়া কেউ এ মাহাত্ম্য বর্ণনা করে নি। তিনি এমন মূল্যবান কথা দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন তা অন্তরকে আশায় ভরে দেয়। তিনি জামাতকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

"এ ধারণা করো না, আমরা পাপী আমাদের দোয়া কি করে গ্রহণীয় হবে? মানুষ ত্রুটি করে। কিন্তু দোয়ার কল্যাণে শেষে কুপ্রবৃত্তির ওপর জয়ী হয়ে থাকে এবং কু-প্রবৃত্তিকে পদদলিত করে দেয়। কেননা, খোদাতাআলা মানুষের মাঝে এ শক্তিও স্বাভাবিকভাবে রেখে দিয়েছেন যেন সে কুপ্রবৃত্তির ওপর জয়ী হয়ে যায়। দেখো, পানির স্বভাবে এটা রয়েছে যে, তা আগুন নির্বাপিত করে। সুতরাং পানিকে যতই গরম করো না কেন এমন কি আগুনের ন্যায় করো তবুও যখন এ আগুনের ওপরে পতিত হবে তখন অবশ্যই আগুনকে নিবিয়ে দেবে। যেভাবে পানির স্বভাবে নিবানোর শক্তি নিহিত তেমনই মানুষের স্বভাবে পবিত্রতা নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্রতার উপকরণ নিহিত রেখেছেন। এ ব্যাপারে ভয় পেও না যে, আমরা পাপে নিমজ্জিত। পাপ সেই ময়লার মত, যা কাপড়ে থাকে এবং দূর করা যায়। তোমাদের স্বভাব যতই কু-প্রবৃত্তির আবেগে ভরপুর হোক না কেন খোদাতাআলার নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকো। তিনি তোমাদের বিফল করবেন না। তিনি পরম সহিষ্ণু। তিনি পরম ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী" (বদর, ১৭ই এপ্রিল, ১৯০৭, জলসা সালানার বক্তৃতা)।

এটা এমন একটি ভরপুর আশার বাণী, যদিও সংক্ষিপ্তভাবে কুরআন করীমে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এটি এমন রঙ্গে বর্ণনা করা হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সংক্ষিপ্তভাবে কুরআন শরীফ থেকে যে রঙ্গে এ মূল্যবান শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন আর কোন গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করা হয় নি। এর ব্যাখ্যার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বাজি মাত করে দিয়েছেন।

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষের মাঝে এমন উপকরণ রয়েছে, যখনই একে কাজে লাগানো হয় সব পাপকে দূর করে দেয় এবং সংশোধন করে দেয়।

স্বভাবের ঝোঁক পুণ্যের দিকে নাকি পাপের দিকে?

এখানে এ প্রশ্ন উত্তাপিত হয়, তাহলে পরে স্বভাবের ঝোঁক কি পুণ্যের দিকে? এর উত্তর এই, স্বভাবের ঝোঁক পুণ্যের দিকেও নয় পাপের দিকেও নয়। অবশ্য আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর যোগ্যতাসমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আর তাকে শক্তি দিয়েছেন যেন সে ওটাকে পুণ্যের দিকে বা পাপের দিকে ব্যবহার করতে পারে। আবার তাকে সকল-সুদৃঢ় পথ দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। যেভাবে বলা হয়েছে-*ইন্না হাদায়নাস্‌ সাবীলা ইম্মা শাকিরাঁওয়া ইম্মা কাফূরা* অর্থাৎ আমরা মানুষকে প্রত্যেক প্রকারের শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছি। সে অকৃতজ্ঞও হতে পারে এবং কৃতজ্ঞপরায়ণও (হতে পারে)।

পৃথিবীতে পাপের আধিক্য কেন?

এখানে প্রশ্ন উঠে, মানুষের মাঝে শক্তি থাকলে সে পাপকে প্রতিহত করতে পারে, সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে পাপের আধিক্য কেন এবং পুণ্য কম কেন?

এ প্রশ্নের জবাব আমি এর আগেও আমার একটি বক্তৃতায় দিয়েছি। কিন্তু বিগত দিনে ৪/৫ জন লোক বিভিন্ন স্থান থেকে এ প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছেন। জানি না একই সময়ে এ প্রশ্ন কিভাবে সৃষ্টি হ'ল।

আসল কথা এই, পৃথিবীতে পাপ বেশি নয় পুণ্যই বেশি। দেখ, একটি চোর যার মধ্যে চুরির দোষ পাওয়া যায়, সে যদি পুণ্য কাজ করে যেমন, সদাচারী হয়, দানশীল হয়, পিতামাতার খেদমতকারী হয়, তাহলে তার মাঝে পুণ্যের গুণ বেশি হ'ল না কম। সুতরাং সচ্চরিত্রকে যদি দৃষ্টিপটে রেখে দেয়া যায় তাহলে জানা যাবে অসচ্চরিত্র কম হবে এবং সচ্চরিত্র বেশি হবে। লোকদের মাঝে অধিকাংশ পুণ্য চরিত্র পাওয়া যায় এবং মন্দ চরিত্র কম। পৃথিবীতে পুণ্য চরিত্রের তুলনায় মন্দ চরিত্র অধিক– এ সন্দেহ দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। এক তো এই কারণে যে, লোকেরা দেখে, পৃথিবীতে কাফির বা অস্বীকারকারী বেশি এবং মু'মিন কম। আর দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, লোকেরা দেখে অধিকাংশ মানুষের মাঝে কোন না কোন দোষ রয়েছে। কিন্তু এ উভয় বিষয় পৃথিবীতে পাপ বেশি তা অবশ্যই প্রমাণ করে না। বরং এ উভয় বিষয় সত্ত্বেও পৃথিবীতে পুণ্য বেশি। যদি প্রথম কথাকে অর্থাৎ

এ বিষয়কে যে, পৃথিবীতে কাফির অধিক নেয়া হয় তাহলে চিন্তা করলে জানা যাবে এটা একটি ধোঁকা। সত্যের ওপরে চিন্তা না করার কারণে এটা সৃষ্টি হয়েছে। এটা সত্য নয় যে, পৃথিবীতে কাফির অধিক বরং সত্য কথা এই, পৃথিবীতে কাফির বলে আখ্যায়িত লোক অধিক। কেননা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে পৃথিবীতে অধিকাংশ সেসব লোকই পাওয়া যাবে যাদের ব্যাপারে আত্মিক দলীল-প্রমাণ পূর্ণ হয় নি। সুতরাং যদিও তাদের নাম বাহ্যিক শরীয়তের ভিত্তিতে কাফির রাখা হয় খোদাতাআলার দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কুফরীর বৈশিষ্ট্যাবলী পাওয়া যায় না। বরং খোদাতাআলা সেসব লোককে হয় আবার সুযোগ দিবেন বা তাদের স্বভাবজ কর্ম অর্থাৎ শির্‌ক ও তৌহীদের ভিত্তিতে তাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার দিবেন। অতএব প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টির সামনে রাখলে বলতে হবে, আসলে ঈমানের পরিমাণই অধিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্য পাপের তুলনায় অধিক।

দ্বিতীয় কারণও অর্থাৎ অধিক লোকের মাঝে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়- বাতিল বলে গণ্য। কেননা, প্রশ্ন এই নয়, অধিকাংশ লোকের মাঝে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় বরং প্রশ্ন এই যে, অধিকাংশ লোকের মাঝে পাপ পরিলক্ষিত হয় কিম্বা পুণ্য। অধিকাংশ লোকের মাঝে যদি অধিকাংশ পুণ্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে পৃথিবীতে পুণ্য অধিক রয়েছে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মানুষের সমষ্টিগত কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি দেবে সে জানতে পারবে, মানুষের কার্যকলাপকে সমষ্টিগতভাবে দেখলে এটাই প্রমাণিত হয়, লোকদের মাঝে অধিকাংশই পুণ্য এবং পাপ কমই। সুতরাং পৃথিবীতে পাপ কম এবং পুণ্য অধিক।

কোন কোন লোক এ স্থলে বলে দেয়, যা কিছুই হোক না কেন যদি অধিকাংশ লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে তো শয়তান জিতে গেল। আমি বলি, না। এর পরও খোদাই জিতবেন আর তা এভাবে যে, খোদাতাআলার একটি নিয়ম এটাও, শাস্তি ভোগ করে সকলেই একদিন জান্নাতে চলে যাবে। সুতরাং কুরআন করীম বলে- *ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লিইয়্যাবুদূন* অর্থাৎ আমি মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন সে আমার বান্দায় পরিণত হয়। মানুষ খোদার বান্দা হওয়ার পরেও শাস্তিতেই পড়ে থাকে, এটা কি করে সম্ভব? তাহলে বুঝা গেল কোন সময় সকলেই জান্নাতে চলে যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআনের অন্য আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, এক সময় সবাই-ই খোদার বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে এবং খোদাই জিতবেন। তাহলে পরে শয়তান আর কোথায় বসে থাকবে? সে-ও জান্নাতে চলে যাবে। এভাবে সে নিজ সত্তার দিক থেকেও হেরে গেল। এখন যারা বলে, শয়তান জিতেছে তারা শয়তানকেও

জান্নাতে দেখে লজ্জা পাবে, আমরা তো তাকেই জিতাতে ছিলাম আর সে স্বয়ংই এখানে এসে গেলো!

এখন আবার আমি পরিপূর্ণ মানবের প্রশংসার কথা পুনরাবৃত্তি করছি। পরিপূর্ণভাবে সে-ই মানুষ যে এ সীমা পর্যন্ত পাপ থেকে রক্ষা পায় যেন তার আত্মা পরবর্তী জীবনের ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় (পরবর্তী জীবনের ধ্বংস অর্থ আল্লাহ্‌তাআলার অসন্তুষ্টি) এবং খোদাতাআলার সন্তুষ্টির পথে পদক্ষেপ রাখতে তড়িৎ তার মাঝে শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যেন এ সীমা পর্যন্ত পুণ্য কর্ম করে। নচেৎ এমনিতে তো এ শক্তি সবার মাঝে সৃষ্টি হবেই।

পাপ কী?

এখন পাপ কী আমি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছি। পাপ সেই কাজ যাতে মানুষের আত্মা রুগ্ন হয়ে যায় এবং ঐশী-দর্শন লাভের যোগ্য থাকে না। আর এজন্যে সেই যাত্রা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় যেজন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কর্মে কোন কোনটি আছে দৈহিক আর কোন কোনটি আছে আধ্যাত্মিক। দৈহিক কর্মগুলো অধিকাংশই এ রকম, যেগুলোর ক্ষতি দেখা যায় যেমন, মিথ্যা, হত্যা ইত্যাদি পাপের ক্ষতি সুস্পষ্ট হয়ে থাকে।

পুণ্য কী ?

পুণ্য বলতে সেসব কর্মকে বুঝায় যাতে মানবীয় আত্মা এতটা সুস্থতা লাভ করে যে, সে ঐশী-দর্শন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। সুস্থ মানুষ বলতে এটা বুঝায় যে, সে সব কাজ-কর্ম করতে পারে নচেৎ ডাক্তার তো প্রত্যেকের মাঝেই একটি না একটি রোগের কথা বলে দেবে। সুতরাং পুণ্য হলো এটাই যেন মানুষের মাঝে ঐশী-দর্শন বা সাক্ষাতের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এতেও আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় প্রকার কর্মই অন্তর্ভুক্ত।

পাপের প্রকার ভেদ ?

আসল বিষয় বুঝার জন্যে পাপ কত প্রকার এ কথা বুঝা উচিত। সুতরাং স্মরণ রাখ এ তিন প্রকার ঃ (১) অন্তরের পাপ, **আসল পাপ**; (২) জিহ্বার পাপ, (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন হাত ও পায়ের এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপ।

পুণ্য কত প্রকার ?

পুণ্যও তিন প্রকার। যেমন (১) অন্তরের পুণ্য, **এটাই আসল** (২) জিহ্বার মাধ্যমে পুণ্য এবং (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুণ্য।

পুণ্যের এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও পাপ কোথা থেকে আসে ?

ওপরের বিবরণ পাঠ করার পর এ ধারণা জন্মিতে পারে, যখন বান্দার উন্নতির জন্যে খোদাতাআলা এতটা শক্তি নিহিত রেখেছেন তখন পাপ কোথা থেকে আসে? এর জবাব এই, পাপের সূচনা নিম্নোক্ত বিষয় থেকে উদ্ভুত ঃ

(১) **মূর্খতা বা জ্ঞানহীনতা** থেকে অর্থাৎ কখনও কখনও মানুষ স্বভাবজ চাহিদা পূরণ করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা দিয়ে কাজ নেয় না এবং সাময়িক সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দান করে। অতএব সাময়িক আনন্দ স্থায়ী স্বাচ্ছেন্দ্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। এর কারণগুলো এই ঃ

প্রথমত মূর্খতা স্থায়ী হোক বা সাময়িক। স্থায়ী মূর্খতা তো প্রকাশ্য। সাময়িক মূর্খতা অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এক সময় মূর্খের মত হয়ে যায়। এর নিম্নোক্ত কয়েকটি উপকরণ রয়েছে (১) **লোভ**-এতদ্দ্বারাও মূর্খতা সৃষ্টি হয়, (২) **রাগ** বা ক্রোধ, (৩) **খুবই প্রয়োজন**, (৪) **স্বাস্থ্য ভঙ্গ**, (৫) **অতিরিক্ত ভয়**, (৬) **অতিরিক্ত ভালবাসা**, এথেকেও মূর্খতা সৃষ্টি হয়, (৭) **অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা**, (৮) **অত্যধিক নৈরাশ্য**, (৯) **জিদ**, (১০) **সীমাতিরিক্ত কামভাব**, (১১) অথবা **কাম ভাবের স্বাভাবিক কম্‌তি**, (১২) **উত্তরাধিকারী** অর্থাৎ কোন কোন ধ্যান-ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং কখনও কখনও অন্যান্য সব ধারণার ওপর আবরণ ফেলে দেয়। এ বারটি মাধ্যম যাতে মূর্খতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয় যে বিষয়টি যাতে পাপ সৃষ্টি হয় তা হলো **সংসর্গের প্রভাব**। মানুষের মাঝে নকল বা অনুকরণ করার শক্তি নিহিত রাখা হয়েছে। সে নিজের চতুর্দিকে যা দেখে একে নকল করে এবং ফলাফলের প্রতি চিন্তা করে দেখে না। সংসর্গের প্রভাব বেশির ভাগ মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দিক থেকে হয়ে থাকে। খেলার সাথী ও শিক্ষকদের প্রভাবও পড়ে থাকে। জাতীয় রীতি-নীতি থেকে যে প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে থাকে তা-ও এতে শামিল।

(৩) তৃতীয়-**ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানও** একটি কারণ। এমনসব কথাকে মানুষ জ্ঞানের কথার অন্তর্ভুক্ত মনে করে নেয় যা আসলে জ্ঞানের কথা নয়। এমন নীতি-নিয়ম অনুসরণ করে যা আসলে ত্রুটিপূর্ণ।

(৪) চতুর্থ, **অভ্যাসও** পাপের অপর একটি উৎস। মানুষ সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা সত্ত্বেও যখন সুযোগ এসে যায় সে মন্দ থেকে রক্ষা পেতে পারে না-যেমন জানে, মদ পান করা খারাপ এবং সিদ্ধান্ত করে পান করবো না। কিন্তু বাইরে গেলো, মেঘলার দিন দেখলো, এমনি একটি পরিবেশে গিয়ে বসলো যেখানে মদের আড্ডা জমেছে, সেখানে কেউ বল্লো, আরে নাও, তুমিও পান করো। তখন সে পান না করার যে সংকল্প করেছিলো তা দূর হয়ে যায়।

(৫) পঞ্চম, পাপের একটি কারণ হ'ল **আলস্য ও গাফিলতি**। একটি কথা জানা আছে, অভ্যেস নেই। কিন্তু তা ছাড়া কাজ করতে অনুরাগ সৃষ্টি হয় না। বলে, আবার করে নিব। এমনিতেই সময় কেটে যায়। আর সে অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে যায়। রসূলে করীম (সঃ)-এর সময়েও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবার পরিবর্তে এটা মনে করে নেন যখন খুশি তখনই তো যেতে পারবো। ফল এই দাঁড়ালো, সেনাবাহিনীর সাথে যেতে পারলেন না। মোটকথা আলস্যের কারণেও মানুষ পাপের মাঝে আট্‌কে পড়ে যায়। এমন মানুষের মাঝে এরূপ উপকরণ থাকে না যে, তাকে বাধ্য করে, ওঠ, এ কাজ করো।

(৬) ষষ্ঠ, পাপের একটি কারণ **যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতাহীনতা** অর্থাৎ এ ফয়সালা করার শক্তি না রাখা যে, এ কাজটা ভাল কি অন্যটা ভাল বা অমুক আবেগকে কতটা সীমা পর্যন্ত কার সাথে এবং কতটা পর্যন্ত কার সাথে ব্যবহার করা উচিত। এক ব্যক্তি স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে এবং মাকে কম। যদিও তার ওপর মায়ের অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি আমাকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার কারণ হয়েছেন আর স্ত্রীর সাথে তার সহযোগিতার সম্পর্ক। সে কেবল তার আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করে। অথবা যেভাবে আজকাল কোন কোন লোক বলে, হযরত মির্যা সাহেব সত্যবাদী; কিন্তু আমরা অমুক পীরের হাতে হাত দিয়েছি। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করার শক্তির অভাবে হয়ে থাকে।

৭। সপ্তম, পাপের একটি কারণ এ **যুগের ধ্যান-ধারণার গুপ্ত প্রবাহ**। অন্যান্য বিষয়ে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করি নি, কিন্তু এ বিষয়ে বর্ণনা করবো। কেননা, বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না।

এছাড়াও কেউ ঘোষণা দিক বা মানাবার জন্যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করুক। কোন ধ্যান-ধারণার প্রবাহ বিশ্বে চল্লে তা প্রভাবিত করবেই। দশটি দুষ্ট লোকের সাথে একটি ভাল লোককে বসিয়ে দাও, সেই দুষ্ট লোকটি অন্তরে দুষ্টামি রাখলে এবং তার ওপরে তা প্রকাশ না করলেও তার অন্তরে মন্দের প্রভাব পড়তেই আরম্ভ করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর এক শিখ ছেলের ভক্তি ছিলো। একবার সে হযরত খলীফা আওওয়ালের (রাঃ) মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে সংবাদ পাঠালো, কয়েকদিন থেকে আমার অন্তরে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এ কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে শুনালেন তখন তিনি বল্লেন, তাকে বলো, কলেজে যেখানে তার বসার স্থান আছে তা যেন বদলিয়ে ফেলে।

সে তা-ই করলো এবং পরে জানতে পারলো, যেদিন থেকে সে বসার স্থান বদলিয়েছে সেদিন থেকেই তার ধ্যান-ধারণার সংশোধন হতে আরম্ভ করেছে। তার প্রাণে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিলো এক নাস্তিক ছেলের নৈকট্য। সেই ছেলেটির নিজ ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করা ছাড়াও তার প্রাণের ধ্যান-ধারণার প্রভাব সেই শিখ ছেলের ওপর পড়তে ছিলো।

সুতরাং ধ্যান-ধারণার প্রবাহ এমন একটি বিষয়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। আর একথা কুরআন করীম এবং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথা দ্বারা প্রমাণিত। এর দৃষ্টান্ত পশু জগতে খুবই বিস্তারিতভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকবার এরকম হয়েছে। দু'টি বিড়াল আপসে ঝগড়া লাগলো। কিন্তু কিছু সময় পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করার পরে তাদের মাঝে একটি নিজের লেজ নিচু করে চলে যায় আর ঝগড়া হয় না।

এভাবে বাঘের ব্যাপারেও গবেষণা করা হয়েছে। ৪/৫টিকে একত্রে যদি দেয়া হয় তাহলে তাদের মাঝে যেটি সবচে' শক্তিশালী সেটি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বাকী সবই নিজেদের লেজ নিচু করে এদিক-সেদিক সরে পড়বে। এ সময়ে তাদের সামনে যদি মাংস ফেলে দেয়া হয় তখন শক্তিশালীটিই কেবল ঘুরবে আর অন্যগুলো হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সম্মোহনী শক্তি (Mesmerism) প্রভাব বিস্তারকারী এক প্রকার জ্ঞান। এটি ধ্যান ও দৃষ্টি প্রবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে আমি একবার গবেষণা করেছি যেন এ জ্ঞানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার ওপর যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে এর জবাব দেয়া যেতে পারে। সে সময়ে আমার নানী আম্মা সাহেবা বলেন, এটা বাজে কথা। এটা যদি এমনই হয় তবে সম্মুখে পাখি বসা আছে একে ধরে দেখিয়ে দাও তাহলে মানবো। পাখীটি দু'আড়াই গজ দূরে বসে ছিল। আমি তার চোখে চোখ রেখে তাকে প্রভাবিত করলাম এবং তার নিকট চলে গেলাম। কিন্তু যখন আমি তাকে ধরার জন্যে হাত উঠালাম তখন যেহেতু আমার হাত আমার ও তার চোখের মাঝখানে এসে গেলো সেটি হাত থেকে ছুটে গেল।

এক ভ্রমণকারী লিখেছে। আমি দেখেছি, জঙ্গলে একটি কাঠবেড়ালী বিচলিত হয়ে দৌড়াচ্ছে। বেশি দূরে যাচ্ছে না। প্রত্যেকবার সে স্থানেই ফিরে আসছে। আমি নিকটে গিয়ে দেখলাম। দেখা গেল একটি সাপ মাথা বের করে এক দিকে দেখছে। শেষ পর্যন্ত সে তার নিকট চলে গেলো এবং সাপটা ওটাকে গিলে ফেলতে যাচ্ছিলো। অমনি আমি এটাকে চাবুক মারলাম এবং সে সরে পড়লো। এটা ছিলো সাপের দৃষ্টি ও ধ্যানের প্রভাব। কাঠবিড়ালী পালিয়ে দূরে যেতে পারলো না আর শেষ পর্যন্ত নিকটে এসে গেলো।

আরও একজন ভ্রমণকারী লিখেছেন। আফ্রিকার একটি জঙ্গলে আমি দেখেছি, একটি পাখী পত্ পত্ করে উড়ছে। যখন নিকটে গিয়ে দেখলাম তখন জানতে পারলাম সাপ তার দিকে ধ্যান করে বসে আছে। আমি সাপটাকে মেরে ফেল্লাম। পরে দেখলাম সেই পাখিটাও, আবার আমাকে ধরে না ফেলে, এ ভয়ে এবং দুঃখে মরে পড়ে গিয়েছিলো।

ইংল্যান্ডে আরো একটি পদ্ধতিতে গবেষণা করা হলো। আর তা এভাবে। একই শ্রেণীর দু'টি পোকা নেয়া হলো। একটিকে পাঁচ মাইল দূরে রেখে দেয়া হলো; কিন্তু সেটি দ্বিতীয় পোকাটির নিকটে নিজে নিজে পৌঁছে গেল। এটাও ছিলো ধ্যান-দৃষ্টি প্রবাহের ফলাফল।

আমেরিকার একজন ডাক্তার পিঁপড়ার ঘর তৈরী করলেন। একে চারদিক থেকে বন্ধ করে দিলেন। এরপর দেখা গেলো বাইরের দিকে পিঁপড়াগুলো চিম্‌টে থেকে ছিলো। যখন সেই ঘরটিকে খোলা হলো তখন জানা গেল যেদিকে পিঁপড়াদের ঘর ছিলো সেই জায়গায় পিঁপড়ারা চিম্‌টে লেগে ছিলো। পুনরায় সেটাকে নিয়ে অন্য স্থানে রেখে দেয়া হলো এবং পিঁপড়ারা সেদিকে গিয়েই চিম্‌টে থাকলো যদিও মাঝখানে দেয়াল প্রতিবন্ধক ছিলো।

এসব ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়, ধ্যান-দৃষ্টির প্রবাহ একটি প্রবল শক্তি। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকেও এটা প্রমাণিত। যখন তিনি কোন এক বৈঠকে বসতেন তখন তিনি সত্তর বার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। এর উদ্দেশ্য এটা নয়, তিনি ভয় পেতেন যেন তিনি (সঃ) নষ্ট না হয়ে যান। কিন্তু এটাও আবশ্যক যে, নবী নোংরামীর ধারে কাছে যেতেও পসন্দ করেন না। এজন্যে তিনি (সঃ) ইস্তিগফার পড়তেন যেন নোংরামী দূরেই থাকে। আবার কোন কোন লোক এমনও বৈঠকে বসা থাকে যারা নিজেরা তো নোংরা নয় কিন্তু অন্যদের প্রভাব গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং তিনি এজন্যেও ইস্তিগফার পাঠ করতেন যেন তাদের ওপর কোন নোংরা প্রভাব না পড়ে।

পাপে দুষণের অবস্থাগুলো

পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে পাপে দুষণের অবস্থাগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। এজন্যে এখন আমি পাপে দুষণের অবস্থাগুলো সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করছি ঃ

প্রথম অবস্থা এই, মানুষ পাপকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে; কিন্তু কখনও কখনও তাকে দিয়ে পাপ সংঘটিত হয়েও যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা এই, পাপকে খারাপ তো মনে করা হয়; কিন্তু অধিকাংশ লোভ-লালসার মোকাবেলা করতে পারে না আর পাপে লিপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় অবস্থা এই, মানুষ পাপকে তো খারাপ মনে করে না তবে পাপ করার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না অর্থাৎ সুযোগ এসে গেলে পাপের প্রতি ঘৃণাও করে না।

চতুর্থ অবস্থা এই, মানুষ পাপকে পসন্দ করে; কিন্তু তার মাঝে লজ্জা-শরমের উপকরণ থাকে তাই লুকিয়ে ছাপিয়ে পাপ করে থাকে। পাপ থেকে যদি ফিরে যায় তাহলে অভ্যাস বা রীতি-নীতি অনুসারে ফিরে যায়।

পঞ্চম অবস্থা এই, মানুষ অভ্যাস ও রীতি-নীতিকে ভঙ্গ করে পাপে জড়িয়ে পড়ার সাহসী হয়ে যায় এবং পাপকে পসন্দ করে।

ষষ্ঠ অবস্থা এই, মানুষ অন্যদেরকে খারাপ কাজে উৎসাহ দিতে থাকে এবং তা ভাল মনে করে থাকে।

সপ্তম অবস্থা এই, মানুষ শয়তানের বিকাশে পরিণত হয় এবং খারাপিকে বিস্তার দান করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

এর মোকাবেলায় পুণ্যের এসব অবস্থা রয়েছে ঃ

প্রথম-পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে পুণ্য করা।

দ্বিতীয়-খোদার আদেশ মনে করে অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে পুণ্য করা।

তৃতীয়-পুণ্যের খাতিরে পুণ্য করা।

চতুর্থ-অভ্যাসের দাস হয়ে পুণ্য করা।

পঞ্চম-পুণ্যে তৃপ্তি লাভ করা।

ষষ্ঠ-পৃথিবীতে পুণ্য বিস্তারের চেষ্টা করা।

সপ্তম-মূর্তিমান পুণ্য হয়ে যাওয়া আর পুণ্যের বিস্তার দানকে স্বীয় একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করা অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা-সদৃশ হয়ে যাওয়া।

এর ওপর আরও স্তর রয়েছে ; কিন্তু তা অর্জন সম্ভব নয় বরং ঐশী দান হিসেবে পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ নবুওয়তের স্তরসমূহ। আমি এর আগে বলে এসেছি, সচ্চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে কেবল এতটুকু পার্থক্য, সেই গুণই যখন বান্দার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন সচ্চরিত্র বা নৈতিকতা বলা হয় আর যখন খোদাতাআলার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন আধ্যাত্মিকতা। সুতরাং যে প্রতিদান একের জন্যে হবে তা অন্যের জন্যেও হবে। এজন্যে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধিগুলোর প্রতিকার আলাদাভাবে বলার আমার কোন প্রয়োজন নেই আর আমি এখানে এসব প্রতিকারের কথা বর্ণনা করার অবকাশও পাচ্ছি না। অন্যান্য

ধর্মাবলম্বীরা এটা বর্ণনা করেছেন বা সূফীগণ এটা বর্ণনা করেছেন। এ জন্যে আমি এর আগে যা বলেছি এর ব্যাখ্যা করার পরে পাপের প্রতিকার সম্পর্কে সেই ইসলামী শিক্ষা যা আমি বুঝতে পেরেছি তা বর্ণনা করছি ঃ

পাপের প্রতিকারের প্রসঙ্গে- পাপ সৃষ্টি হওয়ার পর এর প্রতিকার কিভাবে করা যায় এ প্রশ্নের পূর্বে ইসলাম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার যেন পাপ সৃষ্টিই হতে না পারে? আর এতে কোন সন্দেহ নেই, এ প্রশ্নের জবাবে পাপ দূরীভূত হওয়ার চাবিকাঠি নিহিত। কাপড় ময়লা হয়ে যাওয়ার পরে ধৌত করার চেয়ে কি এটা উৎকৃষ্টতর নয় যে, আমরা এমন পন্থাসমূহ অবলম্বন করি যেন তা ময়লাই না হয়? এটাই যে সবচেয়ে উত্তম ও জরুরী বিষয় এতে কী সন্দেহ আছে? সুতরাং আমরা দেখি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে কেবল এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি যে, পাপ কিভাবে বিনাশ করা যায় বরং এ দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে যেন সবার আগে এদিকে চেষ্টা চালাও যেন পাপ সৃষ্টিই না হয়।

কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, কুরআন করীমে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আর কোন কোন বুযুর্গও এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। জাতি-সত্তা হিসেবে মুসলমানরা এদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দেয় নি। আর প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যে পাপ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে, এ বিষয়টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। যখন লোকেরা এটা বলে, অমুক এখন পাপে লিপ্ত হয়েছে তখন এর অর্থ এই, পাপের যে বীজ তার মাঝে সুপ্ত ছিলো তা বৃক্ষে পরিণত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। নচেৎ বীজ নেই অথচ গাছ জন্মে গেছে এটা কি হতে পারে? এটা অবশ্যই হতে পারে না। পাপ করার যোগ্যতা যদি পূর্বাহ্নেই না থাকতো তাহলে পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তা আসে কোত্থেকে? অতএব আসল কথা এই, পাপ শৈশবকাল থেকেই সৃষ্টি হতে থাকে আর প্রত্যেক মন্দ কাজ পূর্ণ বয়ঃক্রম কাল থেকেই মানুষের অন্তরে উদ্দীপ্ত হতে থাকে, বরং কখনও কখনও তো জন্মের পূর্বেই কোন কোন পাপের সূচনা হতে থাকে। যখন এক ব্যক্তি পূর্ণ বয়সে পৌঁছে তখন আলেমরা বলেন, তাকে পাপ থেকে রক্ষা করো। তখন তো সেই ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে শয়তানের কব্জায়ই চলে গিয়ে থাকে। এর মাঝে সব পাপই পরিলক্ষিত হয়। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এটা নয় বরং আমার উদ্দেশ্য তার মাঝে পাপ করার শক্তি আর এর শিকার হয়ে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে। আমি আগে বলেছি, সচ্চরিত্রের মূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্টি হয়। সেই প্রবণতাই যদি বাল্যকালে নষ্ট হয়ে যায় তখন যদিও শিশুকে একেবারে নিষ্পাপও মনে হয় তথাপি তার মাঝে পাপের প্রতি ঝোঁকের পূর্ণ রসদ মজুদ থাকে।

এখন একটু সঠিকভাবে চিন্তা করো, পাপ কোথা থেকে সৃষ্টি হয়? পাপ কি বংশানুক্রমে সৃষ্টি হয়? সেসব জাতি যারা কোন বিশেষ কাজ করে থাকে সেই ধরনের প্রবণতা তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে পাওয়া যায়। এমন একটি জাতি যার মাঝে বংশ পরম্পরায় বীরের মনোভাব নিহিত না থাকলে তাদের বীর বানানোর চেষ্টা করা হলে যুদ্ধের সময় তারা অবশ্যই হীনমন্যতার বিকাশ ঘটাবে বা তাদের মাঝ থেকে সেই বীরত্ব প্রকাশিত হবে না, যতটা এক জন্মগত বীর জাতি থেকে প্রকাশিত হ'ত। তাই যদিও এ ধরনের বিষয় সংশোধন হতে পারে; কিন্তু তখনও উত্তরাধিকারের প্রভাব অবশ্যই থাকবে।

এমনিভাবে লোভ-লালসা, ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা, কামভাবের আধিক্য প্রভৃতি থেকেও পাপ জন্ম লাভ করে। এখন চিন্তা করো এসব কি সেই অভ্যাস নয় যা শিশুকাল থেকেই শিশুরা রপ্ত করতে থাকে? ওগুলো কি এমন ছোট ছোট নিষ্পাপ অভ্যাস নয় যা সমস্ত পাপের উৎস হয়ে থাকে? পিতা-মাতা বলেন, এটুকুন শিশুই তো তাই অমুক অমুক কাজ করে থাকে। শৈশবকালই কি সেই সময় নয় যখন সবচে' গভীর স্থান দখলকারী নক্‌শা খোদিত হতে থাকে? এক ব্যক্তি যখন কোন দ্রব্য চুরি করে নিয়ে যায়, তাকে বাল্যকালে আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়া হলে বড় হয়ে সে চুরির দায়ে দায়ী কেন হবে? এক ব্যক্তি জেহাদের জন্যে রওয়ানা দেয়; কিন্তু শত্রুর ভয়ে পালিয়ে আসে আর লোকে বলে, কেমন কাপুরুষ! কিন্তু চিন্তা করে দেখলে দেখতে পাবে, তাকে হীনমন্য বানাতে সেসব কিস্‌সা-কাহিনী দায়ী যা তার মা বাল্যকালে তাকে শুনিয়ে থাকবে।

এভাবেই ক্রোধ। বাল্যকালে মা-বাবা দৃষ্টি দেন নি। শিশু বড় হয়ে তাই সকলের সাথে মারামারি ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করে।

আবার পাপ কি ইচ্ছা-শক্তির স্বল্পতার কারণে সৃষ্টি হয় না, আর তা কি কোন কারণ ছাড়া জন্মে। পরিশেষে কারণটা কী? মানুষ সাড়া জীবন আকাঙ্ক্ষা করে করে ভাবতে থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কিছুই হয় না। এ আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতা এক দিনেই তো আর সৃষ্টি হয় না, বরং শৈশবে এবং খুবই শৈশবে জন্ম নেয়। নচেৎ কী কারণে, সঠিক আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও আমি অমুক মন্দ পরিত্যাগ করবো। একে সে পরিত্যাগ করতে পারে না। প্রশিক্ষণ ত্রুটিযুক্ত না হলে মানুষের সংশোধনের জন্যে কেবল এতটুকু বলে দেয়া যথেষ্ট ছিলো যে, অমুক বিষয় খারাপ এবং সে তা পরিত্যাগ করতো। আর সেই বিষয় ভাল এবং সে তা অবলম্বন করতো।

এখন আমি এ দুর্বলতা থেকে সন্তান-সন্ততিকে রক্ষাকারী পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে আলোকপাত করবো ঃ পাপের জন্যে মানুষের মাঝে প্রথম যে অর্গল উন্মুক্ত হয়

তা হলো মা বাবার সেসব ধ্যান-ধারণার প্রভাব যা তার জন্মের পূর্বে তাদের মনে নিমজ্জিত ছিলো। আর সেই দরজা বন্ধ করা হচ্ছে সবার আগে জরুরী কাজ। সুতরাং নিজেদের সন্তান-সন্ততির ওপর করুণা করে নিজেদের ধ্যান-ধারণায় পবিত্রতা সৃষ্টি করা উচিত। সর্বদা পবিত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম না হলে ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত প্রতিকারের ওপর আমল করে যেন সন্তান-সন্ততি এক সীমা পর্যন্ত নিরাপদ থাকে। ইসলাম উত্তরাধিকারের সাথে মিশ্রিত পাপের চিকিৎসা সম্বন্ধে এটা বলেছে, যখন স্বামী ও স্ত্রী সংসর্গে গমন করে তখন যেন এ দোয়া করে ঃ *আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইত্বনা ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বনা মা রযাক্বত্বনা* অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করো এবং যে রিয্ক অর্থাৎ সন্তান আমাদেরকে দিচ্ছো তা-ও শয়তান থেকে রক্ষা করো।

এটা কোন মন্ত্র নয়। যাদু নয়। আর আরবীতে এ কথা বলাও আবশ্যকীয় নয়। বরং নিজের ভাষায় মানুষ এটা বলতে পারে, হে প্রভু! পাপ একটি বড় খারাপ কাজ। এথেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আর সন্তানকেও রক্ষা করো। সেই সময়ের এ ধারণায় তার এবং সন্তানদের চারদিকে প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে যাবে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, - এ দোয়া পড়ে যে শিশু জন্ম নিবে তার ওপর শয়তানের কোন প্রভাব থাকবে না।

কোন কোন লোক বিচলিত হয়ে বলে, আমরা তো কয়েকবার দোয়া পাঠ করেছি; কিন্তু এর এ ফল ফলে নি। কিন্তু সন্দেহের জবাব এই ঃ প্রথমত সেসব লোক সেই দোয়াকে সঠিকভাবে পাঠ করে নি কেবল মন্ত্রের মত পাঠ করেছে। পাপের চিকিৎসা এ দোয়ায় হতে পারে না; কারণ এটা কেবল ভবিষ্যত বংশধরদের পাপমুক্ত রাখার জন্যে।

বংশানুক্রমিক পাপের পরে মানুষের ধ্যান-ধারণায় পাপের মিশ্রণ তার বাল্যকাল থেকেই থেকে থাকে। ইসলাম এর চিকিৎসা এই করেছে ঃ শিশুদের চরিত্র গঠনের সময়-কাল রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিরূপণ করেছেন তখন যখন শিশু জন্মই নেয় নি। আমার ধারণা, সম্ভব হলে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলতেন, যখন সন্তান গর্ভে আসে তখন থেকেই তরবিতের অর্থাৎ চরিত্র গঠনের সময় আরম্ভ করে দেয়া উচিত। যেহেতু তা হতে পারে না তাই জন্মের পর থেকেই তরবিয়তের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা এ ভাবে যেমন তিনি (সঃ) বলেছেন, যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই তার কানে যেন আযান দেয়া হয়। আযানের কথাগুলো মন্ত্রের মত শিশুর কানে ফুঁকে দেয়া হয় না। বরং সে সময় শিশুর কানে আযান দেয়ার আদেশ দেয়ার মাধ্যমে মা-বাবাকে এ বিষয় বুঝানোর উদ্দেশ্য যে, শিশুর তরবিয়তের সময় এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে।

আযান ছাড়াও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকেই আদব-কায়দা শিখানোর আদেশ দিয়েছেন। আর নিজের প্রিয়দেরকেও বাল্যকালেই আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে বাস্তব প্রমাণ রেখে গেছেন। হাদীসে এসেছে, ইমাম হাসান (রাঃ) যখন ছোট ছিলেন তখন একদিন খাওয়ার সময় তিনি (সঃ) তাকে বলেন, 'কুল বিইয়ামীনিকা ওয়া কুল মিম্মা ইয়ালীকা' অর্থাৎ ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও। হযরত হাসান (রাঃ) -এর বয়স সে সময় আড়াই বছরের মত হবে। আমাদের দেশের শিশুরা সারাটা খাবারে হাত লাগালেও এবং সবটাই মুখে পুড়ে দিলেও এমন কি আশ-পাশের লোকদের কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দিলেও মা-বাবা কাছে বসে হাসতে থাকে এবং কোন ভ্রুক্ষেপই করে না বা সাধারণভাবে এমন একটি কথা বলে দেয়, এতে শিশুকে বুঝানোর কোন উদ্দেশ্য থাকে না কেবল অন্যকে দেখানোর মতলব থাকে। হাদীসে আরো একটি ঘটনা এসেছে - একবার হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর মুখে পূরে দেন। তখন রসূলে করীম (সঃ) তার মুখে আঙ্গুল দিয়ে সেটা বের করে ফেলেন। এর উদ্দেশ্য এই, তোমার খাবার তোমার নিজের আয় করে খাওয়া উচিত অন্যের বোঝা হওয়া উচিত নয়।

মোটকথা বাল্যকালই তরবিয়তের সময়। এটা মানুষকে যেভাবে তৈরী করে সে ভবিষ্যত জীবনে তাতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'শিশু ফিতরতের (প্রকৃতি ও স্বভাব) ওপর জন্ম লাভ করে পরে মা-বাবা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা মাজুসী করে গড়ে তোলে' (বুখারী, মুসলিম)। এভাবে এ-ও সত্য, পিতা-মাতাই তাকে মুসলমান বা হিন্দুও বানায়। এ হাদীসের অর্থ এটা নয়, যখন শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন মা-বাবা তাকে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান বানায়। বরং এর অর্থ এই, শিশু বাবা-মা'র কর্ম-জীবন অনুকরণ করে, তাদের কথা-বার্তা শুনে তাতেই পরিণত হয় যা তার মা-বাবা হয়ে থাকে। আসল কথা এই, শিশুদের মাঝে অনুসরণ করার স্বভাব নিহিত। পিতা-মাতা তাদেরকে ভাল ভাল কথা না শিখালে তারা অন্যদের কাজ-কর্ম অনুসরণ করবে। কেউ কেউ বলে থাকে শিশুদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া উচিত। তারা বড় হয়ে নিজেই আহমদী হয়ে যাবে। আমি বলি, শিশুর কানে অন্য কারো আওয়াজ না পড়ে থাকলে, তখন হতে পারে, যখন সে বড় হয়ে আহমদীদের কথা শুনবে তখন আহমদী হয়ে যাবে। কিন্তু যখন অন্যান্য আওয়াজ তার কানে এখনই পড়ছে এবং শিশু সাথে সাথে শিখে ফেলছে তখন সে তাতেই পরিণত হবে যা দেখবে আর যা শুনবে। ফিরিশ্তা যদি তাকে তার কথা না শুনায় তাহলে শয়তান তার সাথী হয়ে যাবে। তার কানে পুণ্য কথা না পড়লে মন্দ কথা পড়বে এবং সে অসৎ হয়ে যাবে।

অতএব পাপের স্রোতকে প্রতিহত করতে চাইলে যেভাবে লাইগ্রেশন ক্যাম্প স্থাপিত হয় সেভাবে বানাও আর ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততি থেকে পাপের ব্যাধি দূর করো যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম রক্ষা পায়।

তরবিয়তের পদ্ধতি

এখন আমি তরবিয়তের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলছি ঃ

১। শিশু জন্মগ্রহণ করলে সবার আগে **তরবিয়তি আযান** দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আগেই বলেছি।

২। **শিশুকে পরিচ্ছন্ন রাখা** হয়। প্রস্রাব, পায়খানা সত্বর পরিষ্কার করে দেয়া হয়। হয়ত কেউ বলবেন, এতো মহিলাদের কাজ। কথাটা ঠিকই; কিন্তু প্রথমে পুরুষের মাঝে এ ধারণা সৃষ্টি হলে মেয়েদের মাঝে পরে হবে। অতএব মহিলাদের এসব কথা বুঝিয়ে দেয়া পুরুষের কাজ। যে শিশু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না তার মাঝে স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা কিভাবে সৃষ্টি হবে? কিন্তু দেখা গেছে, এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। সভায় এসে শিশুর পায়খানা ধরলে কাপড়ে তা করায় এবং পরে মহিলারা তা বগল দাবা করে নেয়। আর কাদিয়ানের আশে পাশের গ্রাম্য মহিলাদের দেখেছি জুতোয় পায়খানা করিয়ে এদিক-সেদিক ফেলে দেয়। যখন শিশুর বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না, তখন অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিভাবে রাখা হবে? কিন্তু শিশু বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে এর প্রভাব তার অন্তরে পড়বে এবং তার অন্তরও পরিষ্কার হবে। কেননা, নোংরামির কারণে যে পাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা পাবে। শিশুর মাঝে প্রথম পাপ যে নোংরামির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এ কথা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী প্রমাণিত হয়ে গেছে। যখন শিশুর মাঝে গোসলের অভাব হয় তখন শিশুর চুলকানি হয়। এতে সে স্বাদ পায় আর এভাবে কামশক্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা গেলে আর সে যতই বড় হতে থাকে ততই তাকে যদি বুঝানো হতে থাকে প্রত্যেক অঙ্গ পরিষ্কার করার জন্যে ধৌত করা আবশ্যক তখন সে কাম-বিকৃতি থেকে বহুলাংশে রক্ষা পেতে পারে। এ তরবিয়তও অনেক আগ থেকে আরম্ভ হওয়া দরকার।

৩। শিশুকে **নির্দিষ্ট সময় খাবার খাওয়ানো দরকার**। এতে শিশুর মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি হয় যেন সে চাহিদার প্রকোপকে প্রশমিত করতে পারে। আর এভাবে অনেক অনেক পাপ থেকে সে রক্ষা পেতে পারে। চুরি, লুট-পাট প্রভৃতি অনেক প্রকারের খারাপ কাজ চাহিদাকে প্রশমিত না করার কারণেই সৃষ্টি হয়। কেননা, এমন মানুষের মাঝে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থাকে না আর এ কারণে এটা হয়ে থাকে যে, শিশু কান্না শুরু করলেই মা মুখে দুধ দেয়। এমনটি করা

উচিত নয়। বরং নির্ধারিত সময় দুধ পান করানো উচিত। আর অধিক বয়সের শিশুদের মাঝে অভ্যাস সৃষ্টি করা দরকার যেন সময় মত খাবার খায়। এতদ্দ্বারা এসব গুণ সৃষ্টি হবেঃ (ক) সময়নিষ্ঠা, (খ) চাহিদা প্রশমিত করা, (গ) স্বাস্থ্য রক্ষা, (ঘ) মিলে মিশে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি। কেননা, যখন তারা সকলের সাথে মিলে মিশে থাকে তখন স্বার্থপরতা ও অহংকার থাকবে না, (ঙ) অপচয়ের অভ্যাস সৃষ্টি হবে না। যেসব শিশু সবসময় খাদ্য-বস্তু নিতে থাকে তারা এথেকে কিছু অবশ্যই নষ্ট করবে; কিন্তু নির্ধারিত সময়ে পরিমাণ মত খাবার তাকে দেয়া হলে সে এথেকে কিছুই নষ্ট করবে না। সুতরাং এভাবে শিশুর মাঝে স্বল্প জিনিস ভোগ করার ও এতদ্দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পুরো করার অভ্যেস সৃষ্টি হবে। লোভ-লালসা মোকাবিলা করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। যেমন, বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় শিশু একটি জিনিস দেখে বলে, ওটা দাও। সে সময়ে তাকে তা না দেয়া হলে সে তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রশমিত করবে এবং বড় হওয়ার পরে মনের লোভ-লালসাকে মোকাবেলা করাটা তার অভ্যাস হয়ে যাবে।

এমনিভাবে ঘরে দ্রব্যাদি পড়ে আছে আর শিশুরা চাইলে বলা উচিত, খাবার সময় দেয়া হবে। এতেও তাদের মাঝে এ শক্তি সৃষ্টি হবে যাতে অন্তরের কামনা-বাসনাকে প্রশমিত করতে পারে। কৃষক খিরা, মূলা, গাজর, শশা প্রভৃতির বেলায় এ রকম করতে পারেন।

৪। শিশুদের মাঝে **নির্ধারিত সময় পায়খানা করানোর অভ্যেস** গড়ে তোলা উচিত। এটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্যেও কল্যাণজনক। কিন্তু এথেকে বড় কল্যাণ এই হয়ে থাকে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সময়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। সময়মত পায়খানা করার ফলে অন্ত্রের অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং পরে নির্ধারিত সময়েই পায়খানার বেগ হয়। ইউরোপের কোন কোন লোক তো প্রাকৃতিক চাহিদার বেগ হলে সময় বলে দেয়, এখন সময় এতটা। কেননা, নির্ধারিত সময়ে তাদের পায়খানার বেগ অনুভূত হয়ে থাকে। তাই শিশুদের ব্যাপারে এটা খুবই জরুরী কথা। সময়মত কাজ করে যে শিশু তার মাঝে নামায রোযার দৃঢ় অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং জাতির কাজে পিছনে পড়ে থাকার অভ্যাস সৃষ্টি হয় না। এতদ্ব্যতিরেকে অযথা আবেগেরও শিকার হয় না। কেননা, অযথা আবেগের একটি বড় উপকরণ অসময় কাজ করার অভ্যাসের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করে অসময়ে খাবার গ্রহণ করা। যেমন, শিশু খেলা-ধূলায় মশগুল রয়েছে। মা সময়মত খাবার খাওয়ার জন্যে ডাকেন; কিন্তু সে আসলো না। পরে যখন আসলো তখন মা বললেন, অপেক্ষা কর খাবার গরম করে দিই। যেহেতু সে সময় তার খুব ক্ষিদে পেয়ে থাকবে এজন্যে সে কান্না-কাটি শুরু করে দেবে এবং

অসংখ্য আবেগের শিকার হয়ে যাবে। কেননা, সে সেই সময়েই খাবার খেতে আসে যখন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে না। আর এ কারণেই সে চিল্লা-চিল্লি করতে থাকে।

৫। এভাবে **খাবার পরিমিত দেয়া দরকার**, এতে স্বল্প-তুষ্টির অভ্যাস গড়ে উঠে এবং লোভ দূর হয়ে যায়।

৬। **বিভিন্ন প্রকার খাবার দেয়া** উচিত। মাংস, বিভিন্ন পদের তরিতরকারী ও ফল-ফলাদি দেয়া উচিত। কেননা, খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমেও বিভিন্ন প্রকার চরিত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের খাবার দেয়া প্রয়োজন। অবশ্য শৈশবকালে মাংসের পরিমাণ কম এবং তরিতরকারীর পরিমাণ অধিক হওয়া প্রয়োজন। কেননা, মাংসে হিংস্রতা সৃষ্টি হয় আর শিশুকালে হিংস্রতা কম হওয়াই প্রয়োজন।

৭। যখন শিশু কিছুটা বড় হয় তখন **খেলা-ধূলার মাধ্যমে তার কাছ থেকে কাজ নেয়া** উচিত। যেমন, থালা-বাটি উঠিয়ে নিয়ে আস। এ জিনিস ওখানে রেখে দাও। এ জিনিস ওমুককে দিয়ে এস। এ ধরনের আরো কাজ-কর্ম করানো উচিত। অবশ্য এক সময় পর্যন্ত তাদেরকে নিজেরভাবে খেলা-ধূলা করার অনুমতিও দেয়া উচিত।

৮। শিশুদের মাঝে এ অভ্যাস সৃষ্টি করা দরকার যেন সে **আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে**। যেমন, সামনে জিনিস আছে অথচ তাকে বলা হ'ল তোমাকে দেয়া হবে না। এটা লুকিয়ে ফেলা উচিত নয়। কেননা, এ দৃষ্টান্ত দেখে সে-ও এভাবেই করবে। আর তার মাঝে চুরি করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে।

৯। শিশুকে **বেশি আদরও করা ঠিক নয়**। বেশি চুমু খাওয়া, চাটা প্রভৃতি অভ্যাস শিশুর মাঝে বহু খারাপি সৃষ্টি করতে পারে। যে সভায় সে যাবে তার আকাঙ্ক্ষা হবে যেন তাকে সবাই আদর-সোহাগ করে। এতে তার মাঝে চারিত্রিক দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

১০। পিতা-মাতার কর্তব্য তারা যেন **সেবার মাধ্যমে কাজ নেয়**। যেমন, শিশুর অসুখ হলে তার জন্যে কোন জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ হলে তারাও যেন না খায়; এমন কি ঘরেও যেন না আনে বরং তাকে বলা উচিত তোমার খেতে মানা সেজন্যে আমরাও খাচ্ছি না। এতে শিশুর মাঝে সেবা ও পরের উপকার বা অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখার গুণ সৃষ্টি হবে।

১১। **অসুখের সময়** শিশুর ব্যাপারে **অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়**। কেননা, হীনমন্যতা, স্বার্থপরতা, বদ-মেজাজী, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি এ ধরনের অসৎ গুণ দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের কারণে সৃষ্টি হয়ে যায়। কোন কোন লোক এরকম হয়ে যায় যে, তারা অন্যদেরকে ডেকে ডেকে কাছে বসায়। আবার কোন কোন লোক এরূপ হয় কেউ তাদের নিকট দিয়েও যদি যায় তখন বলে উঠে, আরে দেখছো না অন্ধ হয়ে গেছো! এ খারাপি দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার কারণে হয়ে থাকে। যেহেতু অসুখের সময়ে রোগীকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করা হয় এজন্যে সে আরাম পাওয়াটাকে নিজের অধিকার বলে মনে করে আর সব সময় আরাম প্রত্যাশা করে থাকে।

১২। শিশুদের **ভীতিপ্রদ কাহিনী শুনানো উচিত নয়**। এতে তাদের মাঝে কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এ রকম লোক বড় হয়ে সাহসিকতার কাজ করতে পারে না। শিশুর মাঝে কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়ে গেলে তাদেরকে সাহসিকতাপূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী শুনানো উচিত এবং সাহসী ছেলেদের সাথে খেলতে দেয়া উচিত।

১৩। শিশুদেরকে **নিজেদের বন্ধু নিজেদেরকে নির্বাচন করতে দেয়া উচিত নয়** বরং পিতা-মাতা যেন বাছাই করে দেন এবং দেখা দরকার, কোন্ শিশুর চরিত্র উত্তম। এতে পিতা-মাতারাও জানবে, কাদের সন্তানরা উত্তম চরিত্রের। দ্বিতীয়ত একে অপরের সাথে সহযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাবে। কেননা, যখন স্বয়ং পিতা-মাতা শিশুদেরকে বলবেন, অমুক শিশুর সাথে খেলবে তখন এভাবে সেসব শিশুর চরিত্রের তত্ত্বাবধানও করা হবে।

১৪। শিশুদেরকে তাদের **বয়সানুপাতে দায়িত্বের কাজ দেয়া উচিত** যেন তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক পিতার দু'টি ছেলে ছিল। সে উভয়কে ডেকে একজনকে একটি আপেল দিয়ে বল্লো, ভাগ করে খাও। যখন সে আপেলটি খেতে যাচ্ছিলো তখন পিতা ডেকে বল্লো, তুমি কি ভাগ করতে জানো। সে বল্লো, না। পিতা বল্লো, যে বন্টন করে সে কিছু কম নেয় এবং অন্যকে বেশি দেয়। এটা শুনে সে ছেলে বললো, তাহলে পরে অন্যকে দিন যেন সে ভাগ করে। মনে হয় সেই ছেলের মাঝে প্রথম থেকেই কুঅভ্যাসের প্রভাব পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে এটা জানা গেলো, সে এ বিষয়টি বুঝে ছিলো, দায়িত্ব আমার কাঁধে এলে আমার অন্যের অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ অভ্যাসের জন্যে কোন কোন খেলা খুবই উপকারী হয়ে থাকে। যেমন, ফুটবল প্রভৃতি।

কিন্তু খেলা-ধূলার বেলায়ও দেখা উচিত যেন কোন কুঅভ্যাসের সৃষ্টি না হয়। সাধারণভাবে দেখা গেছে, পিতা-মাতা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে সমর্থন করেন এবং অন্যদের সন্তান-সন্ততিকে নিজেদের সন্তানের কথা মানতে বাধ্য করেন। এভাবে

শিশুর মাঝে নিজ কথাকে মান্য করানোর জিদ সৃষ্টি হয়ে যায়।

১৫। শিশুদের মনে এ কথা প্রোথিত করে দেয়া উচিত, **সে পুণ্যবান ও উত্তম শিশু**। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কত সুন্দর বলেছেন, শিশুকে গালি দিও না। কেননা, গালি-গালাজ করলে ফিরিশ্‌তা বলে এমনই যেন হয়ে যায় আর সে তা-ই হয়ে যায়। এর অর্থ এই, ফিরিশ্‌তা কর্মের ফল সৃষ্টি করেন। যখন শিশুকে বলা হয় তুই খারাপ তখন সে তার মস্তিষ্কে এ নক্‌শা এঁকে নেয়, আমি তো খারাপই আর সে এ রকমই হয়ে যায়। অতএব শিশুকে গালি-গালাজ করা উচিত নয়। বরং উত্তম আচরণ শিখানো উচিত এবং শিশুর প্রশংসা করা উচিত।

আজ সকালে আমার মেয়ে পয়সা চাইতে এলো। যখন আমি পয়সা দিলাম তখন বাম হাতে নিলো। আমি বল্লাম, এ তো ঠিক নয়। বলতে লাগলো, হ্যাঁ, ঠিক নয় ভুল হয়ে গেছে, আর করবো না। তার ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে সাথে সাথে তা ধরতে পারলো।

১৬। শিশুদের মাঝে **জিদ্ সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়**। শিশু কোন ব্যাপারে জিদ করলে এর প্রতিকার এই, অন্য কোন কাজে তাকে নিয়োজিত করে দেয়া উচিত এবং জিদের কারণ জেনে নিয়ে তা দূর করা উচিত।

১৭। শিশুদের সাথে **শিষ্টাচার (আদব) দেখানো উচিত**। শিশু অনুকরণ প্রিয়। আপনি তাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করলে সে-ও 'তুই' বলা আরম্ভ করবে।

১৮। শিশুদের সম্মুখে **মিথ্যা, অহংকার ও বদ মেজাজ দেখানো উচিত নয়**। কেননা, সে-ও সেসব শিখে ফেলবে। সাধারণভাবে পিতা-মাতা শিশুকে মিথ্যা শিখিয়ে থাকেন। মা শিশুর সম্মুখে কোন কাজ করে থাকে; কিন্তু যখন বাবা জিজ্ঞেস করে তখন বলে দেয়, না করি নি। এতে শিশুর মাঝে মিথ্যা বলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয়, শিশুদের অনুপস্থিতিতে মা-বাবা যেন এ রকম করে; বরং আমার উদ্দেশ্য এই, যারা দুর্বল এসব দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হতে পারেন না তারা যেন কমপক্ষে শিশুর সামনে এরকম কাজ না করেন যেন সেই রোগ পরবর্তী প্রজন্মকে দূষিত না করে।

১৯। শিশুকে **সর্বপ্রকার নেশা থেকে যেন মুক্ত রাখা হয়**। নেশায় শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। নেশাখোর না বুঝে-শুনে অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালের (রাঃ) এক আত্মীয় ছিল। একবার সে একটি ছেলেকে নিয়ে এসে বল্লো, এ ছেলেটিকে নিজের মত করে গড়ে নিবো। সে নেশা প্রভৃতি পান করতো আর ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতো না। হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি তো নিজেই খারাপ। তাকে কেন খারাপ করছো; কিন্তু সে বিরত থাকলো না। সুযোগ মত তিনি (রাঃ) সেই ছেলেটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাকে বুঝালেন তোমার বুদ্ধির কি মৃত্যু ঘটেছে? তার সাথে চলা-ফেরা করো কেন? কোন কাজ শিখো। তাঁর বুঝানোর পরে সেই ছেলেটি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। কিছু দিন পর সে আর একটি ছেলেকে নিয়ে এলো। এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালকে (রাঃ) বলতে লাগলো, এখন যদি তাকে খারাপ করতে পারেন তাহলে জানবো আপনি একজন সুদক্ষ লোক। তার নিকট খারাপ করার অর্থ ছিলো তার কবল থেকে মুক্ত করে দেয়া। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) সেই ছেলেটিকে খুব বুঝালেন এবং বললেন, আমার নিকট থেকে টাকা নাও এবং কোন কাজ করো; কিন্তু সে মানলো না। পরিশেষে সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো। তাকে তুমি কি করেছো? তখন সে বলতে লাগলো, তাকে আমি নেশা পান করাতাম। আর এ কারণে সে আমার অনুসরণ পরিত্যাগ করে তার সে সাহসই হ'ত না। মোটকথা নেশা মানুষকে স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলার শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে।

মিথ্যা সবচে' মারাত্মক ব্যাধি। কেননা, এথেকে উৎপন্ন ফসল খুবই সূক্ষ্ম। শিশুকে এ ব্যাধি থেকে বিশেষভাবে রক্ষা করা দরকার। কোন কোন এমন উপকরণ রয়েছে, যেগুলোর কারণে এ ব্যাধি নিজে নিজেই শিশুর মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন, শিশুর মেধা খুবই উচ্চ আকাশে বিচরণ করে থাকে। সে যে কথা শুনে নিজে নিজেই এর একটি মাহাত্ম্য রচনা করে নেয়। আমার বোন শৈশবে রোজ একটি দীর্ঘ স্বপ্ন শুনিয়ে থাকতেন। আমরা বিচলিত হতাম, কী করে রোজ তার স্বপ্ন এসে থাকে। পরিশেষে জানা গেলো, শোবার সময় যেসব কথা মনে করছেন তিনি তা স্বপ্ন মনে করে নিতেন। সুতরাং শিশু যা চিন্তা করে থাকে সে ঘটনা সে মনে করতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার মিথ্যার অভ্যাস হয়ে যায়। এজন্যে শিশুকে বুঝাতে থাকা উচিত, ধারণা একটি বিষয় আর প্রকৃত ঘটনা আর একটি বিষয়। ধারণার তাৎপর্য ভালভাবে শিশু-হৃদয়ে প্রোথিত করে দেয়া হলে শিশু মিথ্যা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

২০। শিশুকে **একাকী বসে বসে খেলা থেকে বিরত রাখা উচিত**।

২১। **উলঙ্গ হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত**।

২২। শিশুদের এ অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়া উচিত যেন তারা **সবসময় নিজেদের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে**। আর এর পদ্ধতি এই ঃ

(ক) তাদের সামনে নিজের অন্যায়কে ঢেকে দেয়া উচিত নয়।

(খ) শিশু যদি কোন ক্রুটি করেই ফেলে তাহলে তার সাথে এভাবে সহানুভূতি দেখান যেন শিশুর এটা উপলব্ধি হয়ে যায়, আমার কোন বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেছে যার কারণে এসব লোক আমার সাথে সহানুভূতির ব্যবহার দেখাচ্ছে। আর তাকে বুঝানো উচিত, দেখো! ভুলের কারণে এই ক্ষতিটা হয়ে গেছে।

(গ) ভবিষ্যতে ভুল-ক্রুটিমুক্ত থাকার জন্যে শিশুর সাথে এমনভাবে কথা-বার্তা বলুন যেন শিশুর উপলব্ধি হয়ে যায়, আমার ভুলের জন্যে মা-বাবাকে কষ্টে ফেলা হয়েছে। যেমন, শিশু কর্তৃক যে ক্ষতি হয়েছে তারা তার সম্মুখে এর মূল্য প্রভৃতি আদায় করে। শিশুর এ ধারণা সৃষ্টি হবে ক্ষতির ফলাফল শুভ হয় না। প্রায়শ্চিত্তবাদ যদিও খুবই নোংরা ধর্মীয় বিশ্বাস; কিন্তু আমার নিকট শিশুদের এভাবে তরবিয়ত করার জন্যে এটা খুবই প্রয়োজনীয়।

(ঘ) শিশুকে তিরস্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা পৃথকভাবে করা উচিত।

২৩। শিশুকে **কিছু জিনিসপত্রের মালিক করে দেয়া উচিত**। এতে শিশুর মাঝে এসব গুণের সৃষ্টি হয়ঃ (ক) সদকা-খয়রাত করার অভ্যাস, (খ) আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা। যেমন শিশুর কাছে তিনটি টাকা হলে তখন তাকে বলা হয়, এক টাকা দিয়ে কোন কিছু কিনে নাও আর অন্য শিশুদের সাথে মিলে-মিশে খাও। এক টাকা দিয়ে কোন খেলনা ক্রয় করো। আর এক টাকা সদকা-খয়রাত দিয়ে দাও।

২৪। এমনিভাবে শিশুর **এজমালী (সাধারণ) জিনিসপত্র থাকা আবশ্যক**। যেমন, কোন খেলনা দেয়া হয় এবং বলা হয় এটা তোমাদের সকলের। সবাই তার সাথে খেলা করো। কেউ ঝগড়া করবে না। এভাবেই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

২৫। শিশুকে **আদব-কায়দা (শিষ্টাচার) ও সত্যতা শিখাতে থাকা** উচিত।

২৬। শিশুদের **ব্যায়ামের প্রতিও এবং তাকে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বানানের প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার**। কেননা,এ বিষয়টি পার্থিব উন্নতি ও আত্মার সংশোধন এ উভয় প্রসঙ্গে সমানভাবে কল্যাণপ্রদ।

চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার পরিচিতি উপরে দেয়া হয়েছে। এতদনুযায়ী সেই শিশুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত হবে যার মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী দেখা যাবে ঃ

(১) ব্যক্তিগতভাবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তার মাঝে আধ্যাত্মিকতা থাকে, (২) অন্যদেরকে এমন বানানোর যোগ্যতা রাখে, (৩) জামাতের নিয়ম-

আমি আসল বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে বন্ধুদেরকে এই উপদেশ দিতে চাই, তারা যিক্‌রে ইলাহীর (বিভু-স্মরণ) মাহাত্ম্যকে ভাল করে বুঝুন। তারা এখানে কোন খেলা-তামাশার জন্যে একত্র হন নি। আল্লাহ্‌তাআলার যিক্‌র করতে এবং তাঁর নাম নেবার জন্যে এসেছেন। এজন্যে যিক্‌রে ইলাহীর আদবকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হয়, কোন কোন বন্ধু এ আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না আর বিনা কারণে জলসা গাহ্ থেকে উঠে বাইরে চলে যান। এদিকে সেদিকে কথাবার্তা বলতে থাকেন। আমি জানি, জলসায় এক ভারি সংখ্যক অর্থাৎ আটশ' বা এক হাজারের কাছাকাছি গয়ের আহমদী উপস্থিত আছেন। তারা নিজেদের ওপর জোর করে বক্তৃতা শোনায় অভ্যস্ত নন এবং তারা অধিকাংশই জলসা গাহে আসতে যেতে থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় এটা বলে দেয়, সব লোকই কেবল আসে যায় না বরং কোন কোন আহমদীও এ জলসাগাহের বাইরে চলে গিয়ে থাকে এবং বলে, চলো, তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তবলীগ করি; কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার ধর্ম মানুষের প্রতি সবচে' বড় কর্তব্য রেখেছে তার নিজ সত্তার ব্যাপারে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে সময় নিজের হেদায়াতের চেষ্টায় থাক; তখন যদি কোন ব্যক্তি পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয় তাকে হতে দাও; কিন্তু নিজের হেদায়াতের চেষ্টা অন্যের কারণে বিসর্জন দিও না। ধর্মের জন্যে অর্থ কুরবানী করা হয়, প্রাণ উৎসর্গ করা হয়; কিন্তু ধর্ম সেই জিনিস, সারা বিশ্বের খাতিরেও যা বিসর্জন দেয়ার জন্যে কোন মু'মিন প্রস্তুত হতে পারে না। অতএব কোন অপারগতার কারণে জলসাগাহ্ থেকে উঠে যদি যেতেই হয় আর কখনও কখনও এমন জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েও যায়, যেভাবে প্রকৃতির ডাকে সারা দেয়া তাহলে নিঃসন্দেহে যাও; কিন্তু কাজ সেরে সত্বর চলে আসা উচিত। কেননা, কে জানে কখন সেই মুহূর্তটি এসে যায় যে জন্যে মানুষ সারা জীবন চেষ্টা করতে থাকে। একটি সময় এমন আসতে পারে সে সময় একটি কথা মানুষকে কাফির থেকে মু'মিন বানিয়ে দেয়, তাকে শয়তানী থেকে রহমানী বানিয়ে দেয়।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ঘটনার প্রতিই লক্ষ্য করুন। তিনি (রাঃ) রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরোধিতায় চরমে পৌঁছে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর কানে এমন একটি কথা পড়ে গেলো যা তাঁর অবস্থা একেবারেই পরিবর্তন করে দিলো। তিনি রসূলে করীম (সঃ)-কে হত্যা করার জন্যে বের হয়েছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁর আপন বোন মুসলমান হয়ে গেছে। এরপর তিনি তাঁর বোনের ওখানে চলে গেলেন আর ঘরে কুরআন করীম পড়তে শুনলেন। রাগতভাবে ঘরে নিজে প্রবেশ করলেন এবং নিজ ভগ্নীপতিকে মারতে লাগলেন। বোন রক্ষা করতে

এলে তিনিও আঘাত পেলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি লজ্জিত হলেন। বোন বল্লেন, উমর তুমি আমাদের ওপর এজন্যে রাগ করেছো যে, আমরা এক খোদাকে মান্য করেছি। এটা শুনে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো। তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তোমরা যা পাঠ করছিলে তা আমাকেও শুনাও। তাঁর বোন বল্লেন, পবিত্র হয়ে আস তবে শুনাবো। তিনি গোসল করে এলেন। তখন তাঁর সম্মুখে কুরআন করীম তেলাওয়াত করা হলো। এটা শুনে তাঁর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো। তিনি সোজা রসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে গেলেন। এসে কড়া নাড়লেন। যখন জানা গেল উমর এসেছেন তখন কেউ কেউ বল্লেন, দরজা খোলা উচিত নয়। সে কঠোর ব্যক্তি। ক্ষতি না করে বসে। হযরত হামযা (রাঃ) বল্লেন, বিরোধিতার নিয়্যতে এসে থাকলে আমাদের নিকটও তলোয়ার আছে।

শেষে রসূলে করীম (সঃ) তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। যখন সম্মুখে আসলেন তখন রসূলে করীম (সঃ) বল্লেন, উমর আর কত বিরোধিতা করবে? এর পরে তিনি বল্লেন, আমি তো দাসত্ব বরণ করতে এসেছি। এখন দেখো, তাঁর কিভাবে হেদায়াতের সৌভাগ্য লাভ হলো! সেই মজলিসে যদি না যেতেন তাহলে সম্ভবত উমর (রাঃ) ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকতেন। আপনাদের আরামের জন্যে সারাটা বছর পড়ে রয়েছে। এ জন্যে এ কয়েকটা দিন কষ্ট করেও খোদাতাআলার কথা শুনা উচিত এবং কোন মুহূর্ত নষ্ট করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, যেভাবে আমি কাল বলেছিলাম, আমি কুরআন করীমের অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছি আর খোদার আশিসক্রমে ২০শে ডিসেম্বর সূরাতুল বাকারাহ্ এর অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী বছর সাড়ে সাত পারার প্রথম খন্ড প্রকাশ হয়ে যাবে। আমি চাই বন্ধুগণ দোয়া করুন, এ কাজে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। এ কাজকে সম্পন্ন করে এই কর্তব্য থেকে মুক্তি পাই এবং তরজমা ও তফসীর বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

তৃতীয় কথা আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর্থিক সংকটের ব্যাপারে বলতে চাই, এসব সংকটে বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, এটা সত্য জামাতের একটি চিহ্ন। একজন ফরাসী লেখক লেখেন, আমি ২০টি পুস্তক পাঠ করেছি। লেখা আছে মুহাম্মদ (সঃ) মিথ্যাবাদী; কিন্তু আমি সেই পুস্তকগুলোকে কী করবো যখন আমি দেখতে পাই মুহাম্মদ (সঃ) সেসব লোকের মাঝে আছেন যারা গরীব অসংস্কৃতিবান অশিক্ষিত। একটি কাঁচা বাড়িতে বসে আছেন। একটি ছোট কোঠায় এবং তা মসজিদ নামে পরিচিত। এর ছাদ হচ্ছে খেজুর পাতার। ডালাগুলোকেও কাটছাট করা হয় নি। সাফ সুতরা তেমন নয়। আর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন এত পানি পড়ে যে, পানিতেই সিজদা করতে হয়। এরা এমন সব

লোক যাদের সারা দেহ ঢাকার জন্যে কাপড়ও নেই। এরা পরামর্শ করছে কিভাবে সারা বিশ্ব জয় করা যায়। আর পরে এমনটা করেও দেখিয়ে দেয়। সেই লেখক বলেন, লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার মোকাবেলায় যখন আমি এ ঘটনাকে দেখি তখন সব কথা তুচ্ছ বলে মনে হয়।

এভাবেই যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দাবী করেছিলেন তখন আমীর ও বাদশাহ্রা যদি তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যেতেন তাহলে কি করে এটা সাব্যস্ত হতো যে, তাঁর যে সফলতা লাভ হয়েছে তা ছিলো খোদার আশিস? একে আমীর ও বাদশাহ্দের কাজ মনে করা হতো। কিন্তু যখন তিনি দাবী করলেন তখন সব ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সবচে' বড় বন্ধু এবং তাঁর জ্ঞান ও মা'রেফতের সবচে' অধিক জানা ব্যক্তি হলেন মৌলভী মোহাম্মদ হুসায়েন বাটালভী। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি তাকে উঠিয়েছি। আমি তাকে নামাবো। সারা বিশ্বের আলেমরা তাঁর বিরোধিতা করলো। আরব ও অন্যান্য স্থান থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ফতওয়া আনানো হলো; কিন্তু বিশ্বের এতটা বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি একা দাঁড়ালেন আর বল্লেন, এটা ঠিক, কোন ব্যক্তি আমার সাথে নেই এবং সারা বিশ্ব আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে; কিন্তু আমি সেই আহ্বানকে কী করবো যা আমাকে খোদার পক্ষ থেকে শুনানো হচ্ছে- 'দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী এসেছে অথচ দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর বড় বড় শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন'- এই আহ্বানকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? সেই সময়ে সরকারও তাঁর বিরুদ্ধে ছিলো এবং অন্যান্য সবলোক তাঁর শত্রু ছিলো। কিন্তু ফল কী দাঁড়ালো? তিনি এক দিকে ছিলেন এবং সারা বিশ্ব ছিলো অন্য দিকে; কিন্তু এত লোক তার শিকারে আটকা পড়ে গেলো যারা এখানে বসে আছে আর এটা তো এ স্থানের দৃশ্য, বাইরেও লক্ষ লক্ষ লোক মজুদ আছে।

আমি গত বছর যখন সিরিয়া গেলাম তখন দামেস্কের একজন বড় সাহিত্যিক, যাকে সাহিত্যের সংস্কারক মনে করা হয়, আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, আপনি মির্যা সাহেবের পুস্তকাদি এখানে প্রচার করবেন না। এতে ভুল রয়েছে। আর লোকেরা এতে ভুল-ত্রুটি দেখে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবে। আমি বল্লাম, তাহলে আমি এখানে বসে আছি। আর সেই সময় পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাবো না যতক্ষণ তোমার এ দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত না করবো। তোমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদির ব্যাপারে যত আপত্তি করতে চাও করো। এটা শুনে সে বলতে লাগলো, আমি আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি আপনাদের সাথে পাল্লা দিতে চাই না। আমি বললাম, পারলে অবশ্যই করো।

সে বল্লো, এতে আপনাদের ক্ষতি হবে। আমি বল্‌লাম, আমরা মিথ্যাবাদী হলে আমাদের মোকাবেলা করা তোমাদের অবশ্য-কর্তব্য। আর আমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের মোকাবেলায় আমাদের কোন ক্ষতি হবে না বরং উপকার হবে। কিন্তু সে কোন আপত্তি করলো না, বল্লো, আরবেরা এক হিন্দুস্তানীকে মসীহ্ মাওউদ মানতে পারে না। আমি বল্লাম, আমি এখানে মিশন প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা এখানে জামাত প্রতিষ্ঠা করবো। তোমরা শক্তি প্রয়োগ করো। আমরা সেখানে পাঁচ দিনের জন্যে গিয়েছিলাম। খোদার কি কুদরত যখন আমরা যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম তখন একজন আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষার বিশেষজ্ঞ আলেমের রাত দশটার সময় চিরকূট মারফত খবর এলো, সকাল থেকে আমি বসে আছি। হতে পারে এখন সাক্ষাতের সময় না পাওয়া যেতে পারে। এজন্যে এ চিরকূট মারফত জানাচ্ছি, আমি মির্যা সাহেবের ওপর ঈমান নিয়ে এসেছি। এখন আপনি যেখানে চান আমাকে তবলীগের জন্যে প্রেরণ করুন। এখন তো সেখানে আমাদের প্রতিনিধি দলই পৌঁছে গেছে এবং তাদের মাধ্যমে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আর সেই ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন, কোন ব্যক্তি মানতে পারবে না-বলে পাঠালেন আমার ওপর কুধারণা পোষণ করবেন না, কখনও আপনার বিরোধিতা করবো না। অতএব আপনারা দারিদ্র ও দুর্বলতার ধারণা স্থান দেবেন না। সেই ব্যক্তি, যে এটা মনে করে আমরা আমাদের দারিদ্র ও দুর্বলতার জন্যে সফলতা লাভ করবো না, সে মুশরিক। কেননা, সে মনে করে জামাতের কাজ সে করে ফেলবে। আবার যে-ব্যক্তি নিজেকে অকর্মণ্য মনে করে সে-ও খোদাতাআলার ওপর আপত্তি উত্থাপন করে- এ সর্বজ্ঞ সত্তা (খোদা) বিশ্ব বিজয়ের জন্য অকর্মণ্য অস্ত্রকে নির্বাচন করেছেন। তাকে কে উত্তম সৈনিক বলবে, যে ভাঙ্গা বন্দুক ও তলোয়ার উঠিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে বের হয়। আবার যাকে খোদাতাআলার জামাতের সেবার জন্য নির্বাচন করেছেন সে অকর্মণ্য কি করে হতে পারে? সে কাজের লোক। আর যাকে খোদাতাআলা নির্বাচন করেন সে লাঞ্ছিত হতে পারে না বরং সে-ই সম্ভ্রান্ত।

মদীনার একজন প্রভাবশালী নেতা আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে বলেছিলো, মদীনার সবচে' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানকার সবচে' নিকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-কে (নাউযুবিল্লাহ্) মদীনা থেকে বের করে দিবে। আল্লাহ্‌তাআলা এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সে বলে সম্মান তার নিকট রয়েছে। সম্মান তো রসূলকে মান্য করলে হয়ে থাকে। তার কথার ফল এ দাঁড়াল। তার পুত্র রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি শুনেছি আমার বাবা এ রকম এ রকম বলেছে। তার শাস্তি এই, তাকে হত্যা করা হোক; কিন্তু অন্য কেউ হত্যা করুক এটা যেন না

হয়। কোন সময় শয়তান হয়তো আমাকে ধোঁকা দিয়ে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারে। এজন্য তাকে হত্যা করার সেবা আমার উপর ন্যস্ত করুন। একথা শুনে তার নিজের সম্মানের অনুভূতি ভালভাবে হয়ে গিয়ে থাকবে।

আপনারা আপনাদের উপকরণ, জ্ঞান, যোগ্যতার কম্‌তির ওপর দৃষ্টি দিবেন না। এ জামাত যে আয় দিয়ে গঠিত হয়েছে তা বর্তমান আয় থেকে কম ছিলো এবং যখন কয়েক লক্ষ লোককে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে এসেছে তখন এ কয় লক্ষ কোটি লোককে নিয়ে আসবে না কেন? কয়েকদিন হলো আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি-আমি খুতবা দিচ্ছিলাম। আমাদেরকে আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা, বতর্মানে আমাদের স্কন্ধে যে দায়িত্বের বোঝা এথেকে হাজার গুণ দায়িত্ব তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হবে। অতএব ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী প্রজন্ম দেখবে বিশ্বের বিরাট বিরাট শক্তি ও পরাশক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তারা জামাতকে আরো বাড়াতে থাকবে যতক্ষণ লোকেরা এটা বলে না উঠবে, এখন আহমদীয়তকে কেউ মিটাতে পারবে না। কিন্তু খোদাতাআলা এতেও সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি জামাতকে আরো বাড়াতে থাকবেন যতক্ষণ লোকেরা একথা বলে না উঠে, বিশ্বে আহমদীয়তই একটি মযহাব (ধর্মীয় মতবাদ) আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে যখন তাঁর সাথে একজন লোকও ছিলো না তখন বলেছিলেন, খোদাতাআলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তোমার জামাত এত উন্নতি করবে যে, বিশ্বের অন্যান্য জাতি এমন থেকে যাবে যেভাবে আজকাল যাযাবরেরা রয়েছে। অতএব কোন কোন লোক আজ মানবে কেউ কাল, কেউ পরশু। এভাবে রোজ রোজ দিনের পর দিন জামাত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ধনী গরীব সাধারণ মানুষ, বিশেষ লোক ও রাজা বাদশাহ্‌রা এবং তাদের প্রজারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর ঈমান আনবে। এমন কি সারা বিশ্বে এ জামাতই থেকে যাবে আর অন্যান্য মযহাব এর তুলনায় এভাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে যেভাবে সূর্যের উপস্থিতিতে গ্রহ-নক্ষত্র নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এটা খোদাতাআলা কর্তৃক বর্ণিত। এ পূর্ণ হবেই। সুতরাং পৃথিবীর বিরাট বিরাট বাধা আমাদের ঈমানকে নড়বড়ে করতে পারে না আর আমরা লোকদের বিরোধিতায় নিরাশও হতে পারি না। যে-ব্যক্তি এটা দেখেছে- একা এক ব্যক্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামাত সৃষ্টি হয়েছে, সে কি করে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যাপারে নিরাশ হতে পারে? লক্ষ লক্ষ নিদর্শনাবলী দেখে এবং খোদাতাআলার অসংখ্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখে আমরা এ ধারণা করি, বিশ্বকে পরাভূত করতে পারবো না আমরা এমন বেঈমান নই। নিঃসন্দেহে আমরা দুর্বল। আমাদের নিকট বাহ্যিক উপকরণ নেই। আমাদের শক্তি নেই। পৃথিবীকে

আমরা তো পরাভূত করবো না; বরং খোদাতাআলাই করবেন। আর তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অতএব দুঃখ-কষ্টে বাধা-বিপত্তিতে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয় বরং খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়া আবশ্যক।

এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে আসছি। মানুষের পবিত্র আত্মা ও পবিত্র হৃদয় কিভাবে লাভ হতে পারে? কাল এ বিষয় পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম। আর মানুষ কি পর্যায়ে পৌঁছলে নিজের মাঝ থেকে পাপ দূরে রাখতে সক্ষম হয় এবং পুণ্য লাভ করতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এই, পৃথিবীতে মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কেউ নগণ্য আর কেউ গণ্যমান্য। এ কারণে সকল প্রকার স্বভাবের লোকদের জন্যে একই বিধান জারী হতে পারে না। আর সবার জন্যে এক প্রকার চিকিৎসাও কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। পৃথিবীতেই যদি দেখা যায় তাহলে সকলের জন্যে একই রোগের একই ব্যবস্থাপত্র কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। আমি দেখেছি, সর্দি-কাশি হলে একজন রোগীর তো কফি পান করে নিলে দু'ঘন্টায় তার সর্দি বসে যায়। আবার কেউ দৈ-এর সাথে মিষ্টি মিলিয়ে পান করলে এতেই তার সর্দি ভাল হতে থাকে। কিন্তু কোন কোন মানুষ এমন হয়ে থাকে কয়েকদিন চিকিৎসা করানোর পরে ভাল হতে থাকে। অনেকে এমনও আছে, তাদের ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে। আবার কেউ কেউ এমনও হয়ে থাকে, তাদের রোগের ব্যাপারে ডাক্তারদের জ্ঞানই ঘুর-পাঁক খেতে থাকে। এর কারণ কী? এর কারণ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে থাকে এবং তাদের বিভিন্ন রকম চিকিৎসায় কাজ দেয়। কোন কোন বিষয়ের অবস্থা এমনই। আর যেহেতু মানবীয় শক্তির বিভিন্নতা অস্বীকার করা অসম্ভব। এজন্যে চিকিৎসার সময়ে লোকদের বিভিন্নতা ও সামর্থ্যের বিভিন্নতাকে দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন। এ কথাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমি পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করছি। সর্বপ্রথম আমি এ স্বভাবকে নিচ্ছি যা মরিচা থেকে সর্বৈব পবিত্র ও মুক্ত আর যার মাঝে শক্তি থাকে সে বুদ্ধি দ্বারা কাজ নেয় এবং সৎকর্মকে প্রবহমান রাখতে পারে।

সর্বপ্রথম এ কথাকে স্মরণ রাখা উচিত, কেবল মুখে ভাল ভাল কথা বা কাজ-কর্ম ভাল হওয়ার নাম পবিত্রতা নয়; বরং ইসলামের আসল বিষয় হলো অন্তরের পবিত্রতা। যে মানুষের অন্তর পবিত্র নয় সে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে পবিত্র নয়। এক ব্যক্তি একেবারেই কোন পাপ করে না অথচ তার অন্তর পাপ ও মন্দে অনুপ্রাণিত হয় এবং পাপের বর্ণনায় সে স্বাদ অনুভব করে থাকে তখন তাকে পুণ্যবান বা পবিত্র বলা যেতে পারে না যতক্ষণ তার প্রাণেও এটা বিদ্যমান না

থাকে যে, পাপে লিপ্ত হয়ো না। এমনিভাবে কোন কোন লোক এমন হয়ে থাকে, অভ্যাসের দাসত্বে তার ক্রোধ সৃষ্টি হয়; অথচ গালি দেয় না। কিন্তু তার মন বলে অমুক ব্যক্তি বড়ই বদমায়েশ ও খারাপ লোক। এমনসব লোকদের প্রসঙ্গে আমরা বলবো না, সে পবিত্র নয় বরং এটা বলবো, সে তার নোংরামিকে ঢেকে বসে আছে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্রতা হলো অন্তরে। কর্ম ও মুখ তো হাতিয়ার এবং মাধ্যম। এর মাধ্যমে পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা বলেন, *ওয়া ইন তুবদূ মা ফী আনফুসিকুম আও তুখফূহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহ্* অর্থাৎ অন্তরের যে অবস্থা হয় তা হিসাবের অধীন হয়ে থাকে, হয় তোমরা প্রাণের অবস্থাকে লুকিয়ে রাখো অথবা প্রকাশিত করো (সূরাতুল বাকারা ঃ ২৮৫)। এ কারণে খোদাতাআলা কী আশ্চর্য বর্ণনাই না করেছেন! মুখ ও কর্ম তো অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে থাকে। আসল হলো, প্রাণের অবস্থা। খোদাতাআলা এরই বিচার করবেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করো বা গোপন করো অর্থাৎ তোমরা নোংরা কর্ম করো বা মুখ থেকে নোংরা কথা প্রকাশ না করো কিন্তু তোমাদের প্রাণে নোংরা থাকলে তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। অন্য স্থানে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, *ফাত্তাকুল্লাহা মাসতাত্বা'তুম ওয়াস্‌মা'উ ওয়া আতী'উ ওয়ানফিকু খয়রাল্লি* আনফুসিকুম ওয়ামাঁইউকা শুহ্হান্ নাফসিহী ফা উলায়েকা হুমুল মুফলিহূন- অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎকর্ম করো কিন্তু হৃদয়কে পবিত্র করো, কেননা, যার হৃদয়ে খারাবি থাকবে তাকে গ্রেফতার করা হবে (১৭ঃ৬৫)।

আসল পুণ্য হলো অন্তরের পবিত্রতা- এ কথা বুঝানোর পর এখন আমি বলছি যার স্বভাবে মরিচা নেই তার **পাপ থেকে রক্ষা পাবার ৩টি প্রতিকার আছেঃ**

(১) সে যেন পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকে। হয়ত মন এক ব্যক্তিকে বলে, পুণ্য কর্ম করো কিন্তু পুণ্য কী জিনিস তা জানা'ই যদি না থাকে তাহলে কি করবে? এমনিভাবে মন হয়তো তাকে খারাবী থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়; কিন্তু ওমুক কর্ম সম্পাদন করা খারাপ তার এই জ্ঞানই যদি না থাকে তাহলে তা থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারে? অতএব কি করতে হবে আর কি করতে হবে না তা মানুষের জানা আবশ্যক। কেবল কারো কোন কর্ম করাকে বা কোন কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকার সামর্থ্য যথেষ্ট হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির বন্ধুকে খুশী করার আকাঙ্ক্ষা হলো কিন্তু সে কিভাবে খুশী হতে পারে সেই বন্ধু বলে না। তাহলে সে কী করতে পারে? অতএব সর্বপ্রকার খারাপ সম্বন্ধে জ্ঞান ও পুণ্য সম্বন্ধে জানা আবশ্যক।

(২) খারাপ পরিহার ও পুণ্য কর্ম করার সুযোগ কিভাবে লাভ হয় তার এসবও জানা উচিত। এটা এমনই বিষয় যে, চাকরকে বলা হলো, অমুক জিনিসটি উঠিয়ে ভিতরে নিয়ে রেখে দাও; কিন্তু কোথায় রাখতে হবে যদি তার এটা জানা না থাকে তাহলে সে টেবিলের স্থানে চেয়ার চেয়ারের স্থানে টেবিল রেখে দেবে। এ অবস্থাই সেই ব্যক্তির হতে পারে যার পুণ্য কর্ম করার ও খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ ও সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সুযোগ ও সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) আমার মাঝে কোন কোন মন্দ জিনিস রয়েছে যেগুলোকে দূর করতে হবে এ-ও জানা থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ এ বিষয় সম্বন্ধে জানা না হয় সে নিজের চিকিৎসা কিভাবে করতে পারে? সুতরাং আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্যে আমার মাঝে কী কী খারাবি রয়েছে তা জানা থাকা আবশ্যক। আবার কোন্ কোন্ পুণ্যের কম্‌তি রয়েছে যেন খারাবি থেকে রক্ষা পাই আর পুণ্য লাভ করার জন্যে চেষ্টা করি (তা-ও জানা থাকা আবশ্যক)। কোন ব্যক্তির অন্তরে মরিচা ও অন্ধকার এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এবং পরের কথাগুলো বুঝতে পারলে সে পুণ্যবান হয়ে যাবে। নিজের দুর্বলতাগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে কোন মানুষ চিকিৎসা করতে পারে না। আর তা জানা হয়ে গেলে খুবই সহজভাবে চিকিৎসা করতে পারে।

এখন আমি এ তিনটি বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি। প্রথমত আমি খারাবি ও পুণ্যসমূহের জ্ঞান সম্বন্ধে বলছি। আমি দেখেছি, বহু লোক এমন আছে তাদের মাঝে পুণ্যবান হয়ে যাওয়ার সামর্থ্য আছে; তারা মন্দ ও ভাল বিষয় সম্বন্ধে অবহিত নয়। পুরুষদের থেকেও এবং নারীদের থেকেও কেউ কেউ বলে থাকে, আমাদের মাঝে কি (১) অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম আছে (২) অন্যায় অত্যাচার আছে (৩) আমরা কি লোকদের ধন-সম্পদ হজম করছি (৪) মিথ্যা কথা বলে থাকি (৫) ব্যভিচার করি? যদি না থাকে তাহলে পরে আমাদের মাঝে এমন কোন্ খারাবি রয়েছে? যাদের মাঝে এসব না থাকে তারা মনে করে যেন তাদের মাঝে কোন দোষ নেই। আর লোকেরা এ পাঁচটি ত্রুটিকে শরীয়তি বিষয় বলে নির্ধারণ করে থাকে যেন এগুলো ছাড়া আর কোন দোষ-ত্রুটিই নেই, যদিও এ দীর্ঘ ধারা অব্যাহত থাকে এবং দোষ শত শত রকম বের হয়ে আসে। এখন এগুলো সব বর্ণনা করা কষ্টকর। সময়ের দিক থেকেও আর এজন্যেও যে, কোন কোন দোষ-ত্রুটি মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত হয়ে থাকে। আর এমন মানুষ যার সব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে জানা ছিলো তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা। আর মানুষদেরকে দোষ-ত্রুটির সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে; কিন্তু

এতটা জ্ঞান মানুষের হয় নি আর হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যা ছিলো তা হতে পারে না।

একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক বন্ধুকে বুঝাচ্ছি। ব্যায়াম না করাও পাপ অথচ এভাবে আমরা একে পাপ বলি না। একজন মানুষ যার জীবনের ওপর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নির্ভরশীল সে যদি নিজের জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহলে সে পাপ করে। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে বড় আর কোন বাহাদুর ও সাহসী হতে পারে? কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁরও পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। আর তাঁর ঘরের চারিদিকেও পাহারার ব্যবস্থা থাকতো। কেউ বলতে পারে, তিনি নিজের প্রাণকে অন্যের প্রাণের চেয়ে অধিক মনে করতেন; কিন্তু এমন করা আবশ্যক ছিল। কেননা, তাঁর জীবনের সাথে বিশ্বের জীবন ছিলো সম্পৃক্ত। তিনি যদি জীবিত না থাকতেন তাহলে ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো? তাই কোন কোন মানুষের আরাম ও স্বাস্থ্য ভাল রাখাও পুণ্যের কাজ। এর বিপরীত করা পাপের কাজ। শেখ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেব একটি পুস্তকে বলেন, আমার এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো, যতক্ষণ খোদা আমাকে না বলেন, আব্দুল কাদের, ওঠ! তোকে আমার প্রাণের কসম! খাবার খেয়ে নে, ততক্ষণ আমি খাবার খাই না। আবার যতক্ষণ তিনি না বলেন, আমার প্রাণের কসম! কাপড় পর, ততক্ষণ আমি কাপড় পরি না। এর উদ্দেশ্য এই, মর্যাদার মানুষকে যখন খোদা বলেন, নিজের জন্যে নয় আমার জন্যে এ কাজ কর তখন সে করে। কেননা, সে সবকিছু খোদার জন্যে করে থাকে। অতএব পাপেরও এমন পর্যায় আছে যে, মানুষের অবস্থার সাথে সাথে এর অবস্থাও বদলাতে থাকে। এজন্যেই সূফীরা বলেন, চিন্তাশীলদের পাপ সাধারণ মানুষের পুণ্য হয়ে থাকে।

এখন আমি **মন্দের ব্যাপারে মোটামুটি ব্যাখ্যা** করছি ঃ

প্রথমত সেই পাপ যা ব্যক্তিগত হয়ে থাকে অর্থাৎ যার প্রভাব কেবল ব্যক্তির নিজ সত্তার ওপর পড়ে।

(২) সেই পাপ যা অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ এর প্রভাব মানুষের নিজের সত্তার ওপরই কেবল পড়ে না বরং অন্যদের ওপরও পড়ে থাকে।

(৩) সেসব পাপ যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে।

এর মোকাবেলায় পুণ্যেরও ৪টি প্রকারভেদ রয়েছে ঃ

(ক) ব্যক্তিগত পুণ্য অর্থাৎ যার প্রভাব মানুষের নিজ সত্তার ওপর পড়ে।

(খ) সেসব পুণ্য যা অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ যার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে।

(গ) জাতীয় পুণ্য-জাতীয় ক্ষেত্রে যেগুলোকে পুণ্য মনে করা হয়।

(ঘ) সেসব পুণ্য যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে।

এখন আমি সেসব মন্দকর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করছি যেগুলো ব্যক্তিগত মন্দ কর্মের অন্তর্ভুক্ত আর সেগুলোর প্রধান প্রধান মন্দ কর্মের তালিকা দিচ্ছি যেন সেগুলো মনে আসলে সেগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শক্তি সৃষ্টি হয়। এরপর যেসব মন্দ কর্ম রয়েছে সেগুলো ইলহামের মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে ঃ

(১) **তাকাব্বর** অর্থাৎ নিজের সত্তাকে বড় মনে করা। অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করে এক ব্যক্তি নিজে নিজে মনে করতে পারে আমি বড় লোক হয়ে গেছি। তাই একথা তার সত্তাকে পবিত্রতা অর্জন করা থেকে বিরত রাখে।

(২) **দাগাবাজি**। হাট বাজারে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরা ফিরা বা বসা এবং নিকৃষ্ট কাজ অবলম্বন করা। এটাও আত্মার মন্দ বিষয় আর এর কারণেও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ কেউ নিজের অবস্থা ও পেশা পরিবর্তন না করে।

(৩) **তাড়াহুড়া** করা। বিনা চিন্তায় কোন কাজ শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করে। যে তাড়াহুড়া করে এর ক্ষতিও তার ওপর পড়ে।

(৪) **কু-ধারণা** অর্থাৎ অন্যদের বেলায় এ ধারণা করা, সে এরূপ, সে ওরূপ। এ ধারণাকে কখনও প্রকাশ না করে মারা গেলেও এটা পাপ।

(৫) **অবৈধ ভালবাসা** হয় অন্তরেই রাখুক আর কাউকে না-ই বলুক তবুও পাপ।

(৬) **ঈর্ষা** অর্থাৎ তার ক্ষতি করবো, মনে এ ধারণা পোষণ করা। এমন কি কার্যত কোন ক্ষতি না করা হলেও।

(৭) **ভীরুতা** - প্রাণে ভীরুতা সৃষ্টি হওয়া পাপ। এর প্রকাশের কোন সুযোগ না-ও যদি আসে।

(৮) **হিংসা** - তার ক্ষতি হোক আর আমার লাভ হোক অন্যদের বেলায় এ ধারণা করা।

(৯) **বিচলিত** - অর্থাৎ বিপদে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর যে কাজ তার করা দরকার তা করতে না পারা।

(১০) **হীনমন্যতা** - মানুষ নিজের জন্যে বড় বড় আশা পোষণ করে না, ছোট ছোট আশা নিয়ে বসে থাকে।

এ মন্দও বড়ই ধ্বংসের কারণ হয়। বিশেষ করে এটা রাজা বাদশাহ্ ও ধনীদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। কেননা, তাদের কাপুরুষতার কারণে

তাদের প্রজারাও কাপুরুষ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কতই আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করেছেন!

"তোমার সত্তারই কসম আমার প্রিয় আহমদ (সঃ) তোমার অগ্রসর হওয়ার কারণেই আমরা সম্মুখে পদক্ষেপ রেখেছি" অর্থাৎ তুমি (হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) উন্নতি করেছো তাই আমরাও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছি।

অতএব ধনীদের জন্য হীনমন্যতা খুব বড় পাপ। আর জনগণের জন্যেও পাপ।

(১১) **তোষামোদ** - এভাবেই কাউকে খুশী করার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা তোষামোদের শামিল। ধনীদের চাকর-বাকরদের মাঝে এ দোষ অনেক বেশি হয়ে থাকে।

(১২) **অকৃতজ্ঞা** - এর অর্থ কারো অনুগ্রহকে স্বীকার না করা।

(১৩) **অধৈর্য** - এক কাজ করতে গিয়ে শেষ না করাকে অধৈর্য বলে।

(১৪) **আলস্য** - এর কারণে মানুষ কাজই করতে পারে না।

(১৫) **গাফেলতী**।

(১৬) **সত্যকে অস্বীকার**।

(১৭) **সত্যকে স্বীকার না করার সাহসের অভাব**।

(১৮) **কোমলতার বাড়াবাড়ি** - অর্থাৎ সেই সত্তা যার প্রতি দুর্বলতা দেখানো উচিত নয় তা দেখানো হয় বা কেউ এতটা পর্যন্ত কোমলতা দেখায় যে, সব কাজে অকর্মণ্য হয়ে যায়।

(১৯) **মূর্খতা** - জ্ঞান আহরণ না করা।

(২০) **লোভ-লালসা** - এতে লিপ্ত হওয়াও পাপ।

(২১) **রিয়া**- লোক দেখানো কাজ করা।

(২২) **দুরাকাঙ্ক্ষা** - প্রাণে অন্যের ক্ষতির আকাঙ্ক্ষা করা।

(২৩) **সাহস হারিয়ে ফেলা** - কোন সংকটের সম্মুখীন হওয়া আর কাজ পরিত্যাগ করা। এটা বিশেষ করে ধনীদের পাপ।

(২৪) **পাপের প্রতি আসক্তি** - অর্থাৎ মন্দ কর্ম দেখে মন্দ মনে না করা পাপ।

(২৫) প্রত্যেক প্রকারের নেশা করাও পাপ। মদ, আফিম, ভাং, নস্য, চা, হুক্কা সবকিছুই-এর অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন বস্তু এমন, তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় যেমন- চা। এর এমন অভ্যাস যদি হয়ে যায় যে, ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব সৃষ্টি হয়, তখন এর ব্যবহারও খারাপ হতে পারে। কখনও এর প্রয়োজন দেখা দেয়। মানুষ দূর-দূরান্তের গ্রামে তবলীগ করতে যায় সে সময় যদি ফ্লাক্স ইত্যাদি সাথে নিয়ে নেয় আর চায়ের ব্যবস্থা করে তাহলে তা এমন বোঝা হবে যাতে সে খুব কষ্টেই পতিত হবে। যেহেতু ইসলাম এটা চায়, প্রত্যেক মুসলমান যেন একজন সিপাহীতে পরিণত হয় এবং যেখানে পাঠানো হয় সত্বর চলে যায়। এ জন্যে এ ধরনের অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে বলে যা প্রতিবন্ধকতার উপকরণের কারণ হয়ে থাকে। আমি কয়েকবার শুনিয়েছি। একবার সফরে এক পাঠানের নস্যি শেষ হয়ে যায়। তখন সে এক কাশ্মীরীর কাছে খুবই মিনতির সাথে জিজ্ঞেস করে, ভাই তোমার নিকট কি নস্যি আছে? এ দেখে আমি বললাম, নস্যি তাকে তার সম্মুখে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

এখানে কিছুলোক আছে যাদের হুকোর অভ্যাস আছে। পরে তারা এর কারণে কোন কোন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। প্রথম প্রথম আমাদের একজন আত্মীয় ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ঘোর বিরোধী হয়ে যান। আর যেসব লোক এখানে আসতো সে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকতো। তার অভ্যেস ছিল তার উঠানে চৌকি ফেলে হুকো রেখে দিতো। লোক হুকো দেখে সেখানে যেত আর সে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতো আর বলতো, আমি তাদের আত্মীয় আর তাদের সম্বন্ধে জানি। কোন সত্যতা থেকে থাকলে আমরা কি মানতাম না? এভাবে কোন কোন লোক হোঁচট খেতো। একবার একজন আহমদী আসলেন। হুকো পান করতে তার কাছে গেলেন। তাকে তো প্রথমেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বিরুদ্ধে কথা শুনাতে থাকলো। সে যখন নিশ্চুপ বসে থাকলো তখন আবার তার সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে গালিও দিলো। এতেও সে কিছু বললো না। তুমি কি চিন্তা করছো, কথা বলছো না যে? সে বলতে লাগলো, হুকোর শয়তানী অভ্যাস আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এটা না হলে আমি এখানে আসতাম না এবং হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে কথা শুনতাম না।

এখন আমি প্রসঙ্গত বলে দিতে চাই, হুকো খুবই নোংরা জিনিস। প্রথমেও কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এভাবে অন্যান্য নেশাদ্রব্যও খুবই ক্ষতিকারক। এসব পরিহার করা আবশ্যক। কোন কোন নেশা এমন, এদের কারণে মিথ্যার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। আমি এগুলোর নাম নিচ্ছি না। কেননা, যারা এতে অভ্যস্ত তাদের ব্যপারে কুধারণার সৃষ্টি না হয়ে যায়। তবে একথা সর্বৈব সত্যও। কোন

কোন মাদকদ্রব্য স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং কোন প্রকার নেশার অভ্যাসই হওয়া উচিত নয়। আমার কোন জিনিসেরই অভ্যেস নেই। আমাকে বাল্যকালে অসুখের কারণে আফিম খাওয়ানো হতো। ছ'মাস পরে ধারাবাহিকভাবে দেখা হতো। একদিন দেয়া হয় নি তখন আম্মা সাহেবা বলেন, না দেয়ার কারণে আমার ওপর কোন প্রভাব সৃষ্টি হয় নি। এতে হযরত সাহেব (আঃ) বলেন, খোদাতাআলা ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই এখন আর দিও না। আমি যে কোন জিনিসই ব্যবহার করতাম তা ছেড়ে দিলে কোন কষ্ট হতো না। কিন্তু এ ছাড়া চায়ের ব্যাপারে, যা আমাদের ঘরে নাস্তা হিসেবে ব্যবহার হতো, কখনও কখনও ছেড়ে দিতাম যেন অভ্যেসে পরিণত না হয়। মু'মিনের কোন বস্তুর নেশার অভ্যেসের দাসে পরিণত হওয়া উচিত নয়। এ-ও এক মন্দ অভ্যেস।

(২৬) **অন্যকে হেয় মনে করা।**

(২৭) **অন্তরের শত্রুতা।** শত্রুতা প্রকাশ করা হোক বা না হোক অন্তরে পোষণ করলে এ-ও ভাল নয়।

(২৮) **অন্যদের উপরে আস্থা না রাখা।** মানুষ অন্যের ওপর কোন কাজ ন্যস্ত করতে ভয় পায়।

(২৯) **লোভ** - এটাও অন্তরের খারাপি।

(৩০) **সীমাতিরিক্ত দুঃখ করাও খারাপ।** অর্থাৎ মানুষ দুঃখে এতটা বেড়ে যায় যে, কর্ম-শক্তিকে অলস করে দেয়।

(৩১) **সীমাতিরিক্ত আনন্দও খারাপ।**

(৩২) **সম্পর্কহীন কথা-বার্তায় নাক গলানো।** এমন সব কথা যার সাথে তার কোন সম্পর্ক না থাকে অথচ অযথা এর পেছনে পড়ে যায়।

(৩৩) **গাম্ভীর্যহীনতা**-এর অর্থ বেশি বেশি কথা বলা। যখন কোন মানুষের বেশি বেশি কথা বলার অভ্যেস হয় তখন না বুঝেও কথার জবাব দিতে হয়।

(৩৪) **কঠোর প্রাণ**– অর্থাৎ দয়া না করাও এক পাপ বিশেষ।

(৩৫) **অন্যকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়াতে মজা পাওয়া।**

(৩৬) **অপব্যয়।**

(৩৭) **আত্মহত্যা।**

(৩৮) **সেসব মিথ্যে যাতে কারও কোন ক্ষতি হয় না।** কোন কোন লোক অযথাও মিথ্যে কথা বলে।

এখন আমি অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেসব পাপ-কর্ম সম্বন্ধে বলবো। সেগুলো দু'প্রকার। প্রথমত সেসব পাপ যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত সেসব পাপ যা মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টি জীবের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, হুকো পরিত্যাগ করার পদ্ধতি বলুন। হুকোর তুলনায় আফিম পরিত্যাগ করা অধিক কষ্টসাধ্য। এক বন্ধু ছিলো। সে দীর্ঘদিন ধরে আফিম সেবন করতো। যখন সে পরিত্যাগ করতে লাগলো, ডাক্তার বললেন, যদি ছেড়ে দাও তাহলে মারা পড়বে; কিন্তু সে ছেড়ে দিল। এরপর কয়েকদিন তার কষ্ট হলো অথচ পরে তার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল। নেশা পরিত্যাগ করার কয়েকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো; কিন্তু এখন অন্য বিষয় না এনে সংক্ষেপে যা বলতে পারি তা হলো এই, পরিত্যাগ করো।

যেসব পাপ মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে সেগুলো এই ঃ ১। **বে-আদবী**- যাকে সম্মান করা আবশ্যক তাকে সম্মান না করাও পাপ। ২। **অবৈধ ভালবাসার** প্রকাশ। ৩। **অকৃতজ্ঞতা** অর্থাৎ নিজে তো কাজ করিয়ে নিলেন কিন্তু যখন বন্ধুদের সাহায্যের প্রয়োজন হলো তখন 'না' বলে দেয়। ৪। **বালসুলভ ব্যবহার**। এর পরিচয় এই, হঠাৎ রাগ করা। অভদ্র অঙ্গ-ভঙ্গি করা। তড়িঘড়ি করে শাস্তি দিতে উদ্যত হওয়া। বিনা কারণে শাস্তি দেবার ধমক দেয়া। আমি কয়েকবার দু'দোকানদারের ঘটনা শুনিয়েছি। একে অপরকে গালি দিচ্ছিলো। আর অন্যজন বলছিলো, এখন গালি দিলে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। তার মাথা যদি ফাটাবার দরকার ছিলো তো প্রথমে যখন গালি দিয়েছিলো তখনই তো ফাটানো উচিত ছিলো। নতুনভাবে গালি দেবার কী প্রয়োজন ছিলো; কিন্তু সে প্রত্যেকবারই একথা বলে যাচ্ছিলো, এখন গালি দিলে মাথা ফাটিয়ে দেবো। পরে অন্যজন বলতো, একশ' বার গালি দিবো; কিন্তু দিতো না।'আমি এ সময়ে ৮ বছরের শিশু ছিলাম। আর এ দৃশ্য দেখার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। এ কারণে যে, একজন গালি দিক আর অন্যজন মাথা-ফাটাক; কিন্তু কোন ফল হতো না। বরং কিছু সময় পরে উভয়েই নিজ নিজ দোকানে চলে যেতো। আবার সেই সময়ে একজন অপরকে গালি দিলো এবং দ্বিতীয়জন বাইরে এসে বলতে লাগলো, এখন গালি দিবে তো মজা দেখাবো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা এ রকম করতে লাগলো। এ হলো বোকামী বা আহম্মকী এবং হীনমন্যতার চিহ্ন। এভাবে শাস্তিতে সীমার অধিক কঠোরতা করাও বোকামী। অথবা কারো সামান্য কষ্ট লাগলো অমনি চিল্লাচিল্লী করাও বোকামী।

আমি বক্তৃতার সময় প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছি। কিন্তু এ বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে কোন কোন প্রশ্ন যা বন্ধুরা করেছেন ওগুলোর জবাব দেয়া

আবশ্যক মনে করছি। এক বন্ধু জানতে চাচ্ছেন, কোন্ পেশা নিকৃষ্ট। এ প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি নোংরা ঘাটাঘাটি করতে চান আমি তাতে যেতে চাই না। কিন্তু আমি তাকে জবাব না দেই তা সে-ও চায় না। এজন্যে বলছি, সেই পেশা নিকৃষ্ট যা মানুষের বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, হুকো সেবনকারীদের ওসীয়্যত অনুমোদিত হয় কি হয় না। এটা যেহেতু বক্র প্রশ্ন এ জন্যে এখন এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না।

একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, লোভ ও লালসার মাঝে পার্থক্য কী? এর উত্তর এই, লোভ হলো মানুষ অন্যের নিকটে আশা করে যেন অমুক জিনিস তাকে দিয়ে দেয় আর লালসা এই, ওমুক জিনিসটা যদি পেতাম তা যেখান থেকেই হোক না কেন।

৫। **গালি দেয়া ঃ** সব জায়গার লোকই খারাপ মনে করে। কিন্তু পাঞ্জাবে এ রীতি রয়েছে যে, শিশুকে বলা হয়, ওমুককে গালি দাও এবং যখন সে গালি দেয় তখন হাসাহাসি করতে থাকে যেন তাদের দৃষ্টিতে উন্নতি গালি দেয়ার মাঝেই। এ ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি।

৬। **অভিশাপ দেয়া** ।

৭। **বদ্‌দোয়া করা**। অভিশাপ ও বদ্‌দোয়ার মাঝে পার্থক্য কী? পার্থক্য এই। বদ দোয়া মানুষের দৈহিক অবস্থার উপরে আর অভিশাপ মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপরে দেয়া হয়। যেমন, যখন কেউ এ বদ্‌দোয়া দেয় যে, অমুক যেন মারা যায় তখন এটা বদ্‌দোয়া। যখন বলা হয় তার ওপরে অভিসম্পাত তখন এর অর্থ এই হয়, তার অন্তর যেন অপবিত্র হয়ে যায়।

আমি এথেকে সেই অভিসম্পাত আলাদা করি যা বদ্‌দোয়া হিসেবে নয় বরং ঘটনার বিবরণের ওপর হয়ে থাকে। আর তা নবীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এটা বদ্‌দোয়া হয় না বরং এ কথার প্রকাশ হয় যার ওপর অভিসম্পাত করা হয় তার অন্তর অপবিত্র হয়ে গেছে।

৮। **অবিশ্বস্ততা** - কেউ টাকা পয়সা দিল তা ফেরত না দেয়া বা পুরোপুরি না দেয়া।

৯। **গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া**। কারো কোন গোপন কথা জানা হলো এমনি তা বলে বেড়ানো। কিন্তু এটা কখনো কখনো পাপ বলে অভিহিত হয় না। যেমন, এমন সময়ে যখন কেউ অন্যের ক্ষতি করতে পারে তখন ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া খারাপ নয়। যেমন, কেউ জানতে পারলো এক ব্যক্তি যায়েদকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। এখন যদি যায়েদকে এ কথা বলে দেয়া হয় তাহলে তা মন্দ কর্ম হবে না বরং গোপন করা

হবে মন্দ কর্ম। এমনিভাবে সরকারের বিরুদ্ধে যদি কোন ষড়যন্ত্র করে, তার বদনাম করে অথবা তার ক্ষতি করতে চায় তখন যে এসব বিষয় জানতে পারে তখন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া তার অবশ্য-কর্তব্য।

১০। **চুকলামি**

১১। **উৎসাহের সাথে সাক্ষাৎ না করা**। এতে অন্যের ওপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আর ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

১২। **অবৈধ পক্ষাবলম্বন**। দু'ব্যক্তি ঝগড়া করছে। তাদের মাঝে একজন বন্ধু। তখন তাকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করা হয়।

১৩। **ধোঁকাবাজী** ১৪। **কৃপণতা** ১৫। **অত্যাচার**। ১৬। **বাহ্যিকভাবে অকৃতজ্ঞতা** অর্থাৎ যার কাছ থেকে উপকৃত হয়েছে তার সম্বন্ধে এটা বলা যে, সে কখনও উপকার করে নি।

১৭। **নোংরামি** ১৮। **অমনোযোগিতা** ১৯। **কলহ-বিবাদ** ২০। **বিপর্যয়**। আমি এগুলোর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকলাম। কেননা, লোকেরা এগুলো সম্বন্ধে জানে।

২১। **চিল্লা-চিল্লি করা** - বাজারে দাঁড়িয়ে চিল্লা-চিল্লি করা, ইজতেমাতে একথা সে কথা বলে গোলমাল সৃষ্টি করা। আর যারা কাজ করে তাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাও একটি অনেক বড় দোষ। আমি ইউরোপবাসীকে দেখেছি- তারা এসব কথার প্রতি খুবই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। সভা-সমিতিতে কেউ একদিক থেকে নিশ্চুপ হয়ে গেলে সবাই চুপ করে যায়। আর তা এজন্যে, আমাদের শব্দে তাদের না কোন অসুবিধা হয়।

২২। **নির্যাতন করা** ২৩। **শক্তি প্রয়োগ** ২৪। **ডাকাতি** ২৫। **হত্যা** ২৬। **চুরি**। আমি অপেক্ষা করছিলাম। এ ব্যাপারে না আবার কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সুতরাং এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, বন্ধুত্বের রীতি অনুযায়ী চুরি করে থাকে। সুতরাং কোন কোন গ্রামে এ রীতি প্রচলিত, একে অন্যের জিনিস চুরি করে নেয়। এ-ও খারাপ কাজ।

২৭। **মারপিট করা** ২৮। **গর্ব করা** ২৯। **অপবাদ দেয়া** ৩০। **পরনিন্দা করা** ৩১। **ছিদ্রান্বেষণ করা**।

ছিদ্রান্বেষণ করা ও চুকলামির পার্থক্য এই। কারও দোষ-ত্রুটি অন্যের নিকট বলে বেড়ানো যেন সে নিন্দিত হয়, এর নামই ছিদ্রান্বেষণ। আর চুকলামি দ্বারা বুঝায় কোন ব্যক্তি কারও সম্বন্ধে কিছু মন্দ বলে ছিল তাকে গিয়ে বলে দেয়া যেন তারা পরস্পর ঝগড়া বাধায়।

৩২। **অভিযোগ করা**। ৩৩। **অন্যকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা**। **লোকদের মাঝে নিন্দা করা**। ৩৪। **খারাপ নামে ডাকা**। যেভাবে আমাদের দেশে লোকদেরকে বিভিন্ন নাম দিয়ে ডাকা হয়। ২৫। **হাসি-ঠাট্টা করা**। অর্থাৎ হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য ঠাট্টা-মশ্‌করা করা। ৩৬। **ভেংচি কাটা,** যেভাবে আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েরা ও মহিলারা এতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। ৩৭। **কৌশল করা** অর্থাৎ কি করে অমুকের ক্ষতি করা যায় সে চিন্তা করা। ৩৮। **অত্যাচার** অর্থাৎ শাস্তি না দিয়ে কষ্ট দেয়া। ৩৯। **রাগান্বিত হওয়া-** সেই রাগ যা প্রকাশ করা হয়। ৪০। **প্রতিশোধে কঠোরতা** - যতটা প্রতিশোধ নেয়া দরকার এর চেয়ে অধিক নেয়া। ৪১। **ঘুষ-নেয়া**। ৪২। **ঘুষ দেয়া**। ৪৩। **সুদ খাওয়া**। ৪৪। **সুদ দেয়া**। এগুলো হলো মোটামুটি খারাপ কাজ। এগুলো অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে।

এখন আমি সেসব মন্দ বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করছি যেগুলো মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

১। **দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ব্যবহার করা**। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেলে ফিরিশ্‌তাদের কষ্ট হয়। আর তারা এমন মানুষের কাছে আসে না।

২। **বিনা কারণে ঘরে কুকুর পোষা**। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে কুকুর থাকে সেই ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা আসে না।

এখন আমি সেসব খারাপ বিষয়াদি সম্বন্ধে বলছি যা অন্যান্য পশুদের সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

১। **পশুকে বিনা কারণে প্রহার করা**।

২। **পশুদেরকে বেশি করে খাটিয়ে নেয়া**।

এসব মন্দ কাজে কৃষকরা সাধারণত জড়িত থাকে। তারা পশু দিয়ে কাজ নেয়। যখন তারা কাজ করতে অসমর্থ হয়ে যায় আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তখন কসাইদের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয়, জবাই করা অবৈধ বরং আমার বলার উদ্দেশ্য এই, এমনভাবে কাজ নেয়া উচিত নয় যেন অতি পরিশ্রমে কাজের অযোগ্য হয়ে যায়। এটা অবৈধ।

৩। **পশুদেরকে খাবার কম দেয়া আর কাজ বেশি নিতে থাকে**-এ খারাপ কাজে কৃষকরাই বেশি জড়িত থাকে না অন্যরাও থাকে। কৃষকদেরকে তো দেখা যায় তারা নিজেরা না খেয়ে থাকে অথচ পশুদের চারা (পশুর খাদ্য) অবশ্যই

যোগাড় করে থাকে। কৃষকদের এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগে-যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তারা এ কথা বলে না, আমার কিছু নেই বরং বলে পশুদের খাবার কিছু নেই।

৪। **অসুখ হলে পশুদের চিকিৎসা না করানো।**

৫। **পশুদের নির্যাতন করা।** ৬। **দাগ দেয়া।** রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার দেখলেন একটি গাধার মুখে দাগ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এখানে দাগ লাগিও না, কেননা এ স্থানটি খুবই অনুভূতিপ্রবণ। দাগ দিতে হলে পিঠে দাও।

৭। **পশুদের ঠান্ডা গরমের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।**

৮। **পশুদের যৌনাবেগের প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য।**

মানুষের মত পশুদের মাঝে এমন শক্তি নিহিত। এজন্যে হয় তাদের যৌন শক্তি দূর-করার ব্যবস্থা নাও নচেৎ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৯। **সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া** অর্থাৎ তাদের সামনে তাদের বাচ্চাদেরকে জবাই করা বা ক্ষুধার্ত রাখা বা অন্য কোন পন্থায় দুঃখ দেয়া।

এখন আমি তৃতীয় প্রকারের মন্দ কাজ সম্বন্ধে বলবো। **এ কাজ জাতীয় পর্যায়ে করা হয়ে থাকে ঃ**

১। **যৌন চর্চা ও অশ্লীলতা প্রচার করা।** কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মাঝেই বলে বেড়ায় যে, অমুক ব্যক্তি মিথ্যেবাদী তাহলে এটা অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত মন্দ কাজ নয় বরং জাতীয় পর্যায়ে মন্দ কাজ। কেননা, যে জাতির মাঝে এ ঘোষণা হতে থাকে, সে জাতির মাঝে মিথ্যেবাদীও থাকে। সততার মর্যাদা মিটে যেতে থাকে। আর এর মাঝে মন্দের ব্যাপকতা লাভ হতে থাকে। অশ্লীলতা আমার কাছে আত্মহত্যার শামিল।

২। **স্বার্থপরতা** - যখন জাতীয় কল্যাণের বিপরীতে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয় তখন নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা আর জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া জাতীয় অকল্যাণ।

৩। **দুষ্কৃতি ও অপরাধ।** যেমন পতিতাদের ব্যবসায়। আসর জমানো বা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মদ সেবন করা।

৪। **জাতীয় কর্তব্য পালনে শিথিলতা প্রদর্শন।**

৫। **সন্তানদের চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগ না দেয়া।**

৬। **সন্তানদের লেখা-পড়ার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া।** যেসব লোক এর প্রতি দৃষ্টি দেয় না সে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা, সন্তানরাই জাতির ভবিষ্যত।

৭। **নোংরা-ময়লা**। আগেও এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এজন্যে বলা হয়েছিল যে, এতে লোকেরা দুর্গন্ধ পায় ও কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু এখানে এজন্যে বলা হচ্ছে, এতে রোগ-ব্যাধিও সৃষ্টি হয় আর জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

৮। **দায়িত্বের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা**। হারিয়ে ফেলা অর্থ হলো কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত থাকা। অর্থাৎ মানুষ এটা অনুভব করে না, আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো তা পালন করা আমার অবশ্য-কর্তব্য ছিলো।

৯। **কাজ ও দায়িত্ব পালন না করা** এবং ক্ষতি হওয়ার প্রেক্ষিতে সহ্য না করা; ভুলে কাজ না করার বা জেনে-বুঝে করার কারণেই হোক না কেন।

১০। **বিদ্রোহ**।

এক বন্ধু একটি প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু আমি নিজেও এ প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছিলাম এ জন্যে সুযোগ পেয়ে জবাব দিচ্ছি। সে বন্ধু জানতে চান আমাদের জামাতকে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা বা মন্দ কথা প্রয়োগ করা উচিত নয়। তিনি আমাদের বক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন কঠোর ভাষা ব্যবহার করা না হয়। আমিও এ প্রসঙ্গে তাগিদ করছি। তারা আমার লেখায় কখনো এমন ভাষা দেখবেন না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য ও গালি গালাজ শুনে আমার কি রাগ ওঠে না? ওঠে, কিন্তু আমি কখনও কঠোর ভাষার পরিবর্তে কঠোর ভাষা ব্যবহার করি না। কোন কোন লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোন কোন লেখার উদ্ধৃতি দেয়। তাদের মনে রাখা উচিত হযরত সাহেব প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে বিচারক ছিলেন। আর তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ছিলো যেন লোকদেরকে ওগুলোর আসল তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের অবস্থান এ রকম নয় এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও গালি-গালাজ করা দুর্বলতার লক্ষণ। আজকাল সম্ভবত এতে কারও মনে তৃপ্তি হয় কিন্তু ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম আস্ছে তারা যখন এসব লেখা পাঠ করবে তখন বলবে, হায়। আমাদের বাপ-দাদারা যদি এমনটি না করতেন। কেননা, তারা ঠান্ডা মাথায় এ মতবাদ সম্বন্ধে পাঠ করবে। তারা রাগ করবে না। তাদের সম্মুখে বিরুদ্ধবাদীদের লেখাগুলো থাকবে না। সে সময় তারা এসব পুস্তিকাদি ও পত্র-পত্রিকা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে যাতে কষ্টের ও কর্কষ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

১১। **অতিথি সেবার প্রেরণা না থাকা**। এটাও জাতীয় অপকর্ম।

১২। **ব্যবসায় ধোঁকাবাজি করাও জাতীয় অপকর্ম**।

হাদীসে এসেছে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উপদেশমূলক নির্দেশ দিতেন। একের পর অন্য লোকেরা প্রশ্ন করা আরম্ভ করে দিলো। এতে তিনি আবেগপূর্ণ হলেন আর বল্লেন, করো যত পারো প্রশ্ন করতে থাকো। আমি উপদেশ দেয়া বন্ধ করলাম। এখন যা জিজ্ঞেস করার করো। আমি কিয়ামত পর্যন্ত সব কথা বলে দিচ্ছি। এভাবেই আমিও বলছি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে। আমি কি বক্তৃতা বন্ধ করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া আরম্ভ করবো। যে বিষয় আমি বলছি এর নোটের এখন পর্যন্ত কেবল ৩৫ পৃষ্ঠার ওপর বক্তব্য রেখেছি আর ২৫ পৃষ্ঠা অবশিষ্ট রয়েছে। আমি যদি প্রশ্নের উত্তর দেয়া আরম্ভ করে দিই তাহলে বিষয়টি কিভাবে শেষ হবে?

আমি বলছিলাম, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধোঁকাবাজী করাও জাতীয় অপরাধ। কেননা, এতদ্‌দ্বারা জাতীয় বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়। আমি যখন কাশ্মীর গেলাম তখন পর্যবেক্ষণ করেছি রূপোর বাসন-কোষণ ইত্যাদির ব্যবসায় যা এক কোটিতে ছিলো লোকদের অবিশ্বস্ততার কারণে **এখন কেবল ১৭ লক্ষে পৌঁছেছে**। [যেভাবে বাংলাদেশের চিংড়ি মাছের ব্যবসায়ের অবস্থা দাঁড়িয়েছে-অনুবাদক]।

১৩। **কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে** সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের সম্মুখে সমালোচনা করা।

১৪। **কারও নাম না নিয়ে** জাতির সাধারণ দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে ঘোষণা করা যেমন, এ রকম বলা যে, আমাদের মাঝে অনেক ধোঁকাবাজ রয়েছে। এর ফলে সেই জাতি এমনই হয়ে যায়।

১৫। জাতীয় উদ্দেশ্য পুরো করতে সাহায্য যোগাতে অনীহা দেখানো।

১৬। যেসব লোক দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয় তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখা।

১৭। সরকারী ও জামাতী কর্মকর্তার সাথে সহযোগিতা না করা।

১৮। আনুগত্যের অভাব।

এখন আমি **খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কিত মন্দ বিষয়ের উল্লেখ** করছি ঃ

১। **বিনা কারণে কসম খাওয়া,** বিচারকের সম্মুখে কসম খেতে হয় বা এমন অন্য কোন বিশেষ ব্যাপার হোক সেজন্যে কসম খাওয়া আবশ্যক হয় তখন কসম খাওয়া যেতে পারে। নতুবা এমনিতেই কসম খাওয়া খোদাতাআলার নামের অবমাননা করার নামান্তর।

২। **নৈরাশ্য** যে, এখন আমার অসুবিধা দূর হতে পারে না। এটা খোদাতাআলার উপরে কুধারণার ফলে সৃষ্টি হয়।

৩। **অন্তরে নোংরামী জমা করা**। খোদাতাআলা এ জন্যে অন্তর সৃষ্টি করেছেন যেন একে তাঁর ঘর বানানো হয়। এ জন্য অন্তরকে আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। আর যে অন্তরকে খারাপ করে সে যেন খোদাকে তাঁর ঘরে আসতে বাধা সৃষ্টি করছে।

৪। **শরীয়তের বিধি-নিষেধকে অস্বীকার করা**।

৫। **পঞ্চম মন্দ-কর্ম হলো মিথ্যা ধর্মীয়-বিশ্বাস** যেমন-শির্‌ক (অংশীবাদিতা) ইত্যাদি।

৬। **ষষ্ঠ মন্দকর্ম হলো সমস্ত প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসকে অস্বীকার করা,** যেমন খোদাতাআলার ফিরিশ্‌তা, রসূল, ইলহাম, বেহেশ্‌ত ও দোযখ অস্বীকার করা।

৭। **সপ্তম মন্দকর্ম হলো শরীয়তের আদেশসমূহ ভঙ্গ করা-হোক না তা ইবাদতের বিষয়ে বা সভ্যতা কৃষ্টির বিষয়ে**। যেভাবে নামায না পড়া, হজ্জ না করা, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে আদেশ রয়েছে তা মান্য না করা। সচ্চরিত্র হওয়ার বিষয়গুলো পালন না করা। কেননা, যখন সেসব আদেশকে খোদাতাআলা নিজের দিকে আরোপ করেছেন তখন ওগুলোকে মান্য না করা যেন আল্লাহ্‌তাআলাকে অসন্তুষ্ট করা। যেভাবে এসব বিষয়াদির ধার না ধারলে যেমন (আল্লাহ্‌র) বান্দাদের কষ্ট হয় তেমনি খোদাতাআলাও অসন্তুষ্ট হন।

৮। **আট নম্বর মন্দ কর্ম হলো খোদাতাআলার প্রতি ভালবাসার ঘাট্‌তি**।

৯। **নবম মন্দকর্ম হলো খোদাতাআলা ও রসূল (সঃ)-এর অবমাননা করা**।

১০। যতটা মন্দকর্ম অন্যদের সাথে করা তা খোদাতাআলার সম্পর্কেও করা হয় যেমন **অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন**। এটা মানুষের সাথে করা হয়। খোদাতাআলার সাথেও হতে পারে। এভাবে আরও কোন কোন মন্দ কর্ম আছে।

এখন আমি পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে বলছি। প্রথমে **ব্যক্তিগত পুণ্যকর্মসমূহ সম্বন্ধে** বলছি ঃ

১। **বীরত্ব ও সাহসিকতা** ২। **চৌকষ থাকা** ৩। **জ্ঞান শিক্ষা করা** ৪। **বিনয়** ৫। **আত্মাভিমান** অর্থাৎ কোন মন্দ কর্ম হতে দেখলে খারাপ মনে করা ৬। **কৃতজ্ঞতা** ৭। **সু-ধারণা** ৮। **অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া** ৯। **পরিশ্রম** অর্থাৎ খুব কাজ করার অভ্যেস ১০। **লজ্জাশীলতা** ১১। **দয়া-দাক্ষিণ্য**, কারও দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করা ১২। **পুণ্যকর্মে উৎসাহ বোধ** ও একে চালু রাখা ১৩। **গাম্ভীর্য** অর্থাৎ অযথা ও বিনা কারণে অন্যকে কোন ব্যাপারে অনুকরণ না করা।

আমাদের দেশে এ দোষ সর্বত্র দেখা যায়। ইংরেজরা যা করে তা নকল করা আরম্ভ করে **১৪। উচ্চ সাহসিকতা ১৫। ধৈর্য ১৬। স্বকীয়তা** অর্থাৎ বিনা কারণে অন্ধভাবে অনুকরণ না করা ১৭। **কৃতজ্ঞ হৃদয়** অর্থাৎ মনে প্রাণে অনুভব করা যে, অমুক এ অনুগ্রহ করেছে ১৮। **সত্যানুসন্ধান** অর্থাৎ সত্যের অন্বেষণ করা ১৯। **কারও গুণগাহী হওয়া ২০। সহানুভূতি**। দয়া আর সহানুভূতির সাথে পার্থক্য এই। দয়া অর্থে কারও কষ্ট দেখে তাকে সাহায্য করার ধারণা সৃষ্টি হওয়া আর সহানুভূতি অর্থ কারও কষ্ট দেখে মনে দুঃখ অনুভব করা ২১। **নিজের অধিকার রক্ষার্থে মোকাবেলা করার শক্তি**। অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের অধিকার উপেক্ষা করা অন্য কথা। অথবা এ রকম বলা যেতে পারে, নিজের দুর্বলতার কারণে তা না হয়। কিন্তু কারও চাপে নিজের অধিকার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ২২। **সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি**। অর্থাৎ এ শক্তি যেন পুণ্যকর্মে অন্যকে পিছনে ফেলে যাওয়া ২৩। **নিজের হার ও পরাজয় মেনে না নেয়া**। এমন কি কয়েকবার পরাজিত হলেও হার না মানা। এর উদ্দেশ্য এই নয়, মুখে স্বীকার না করা বরং এতে তৃপ্তি লাভ না করা এবং এর প্রভাব দূর করতে চেষ্টা করতে থাকা। ২৪। **অতন্দ্র থাকা** অর্থাৎ নিজের শত্রুর ব্যাপারে অমনোযোগী না হওয়া ২৫। **সত্যকে স্বীকার করা ২৬। সহনশীলতা**। অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকা ২৭। **পরিশ্রমী** অর্থাৎ যত কাজই সম্মুখে আসে বিচলিত না হওয়া ২৮। **সাহসী ২৯। পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ ৩০। লোকদেরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা** অর্থাৎ সাহায্যের সুযোগ আসলে অবশ্যই সাহায্য করবো ৩১। **সাদা-সিদা জীবন যাপন** করা। নিজের আত্মার আরাম-আয়েশের জন্যে বেশি খরচ না করা। ৩২। **নিজের মান সম্মান রক্ষা করা**। ৩৩। **অন্যের গুণগ্রাহী হওয়া ৩৪। প্রত্যেক কথায় মধ্যম পথ অবলম্বন করা**।

এখন আমি সেসব পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে বলবো যা অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখেঃ

ফিরিশ্তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী পুণ্য এগুলো- ১। **যিক্‌রে এলাহী** (বিভু-স্মরণ)। লেখা আছে যেখানে যিক্‌রে এলাহী হয়ে থাকে সেখানে ফিরিশ্তারা ভীড় জমায়। আর রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিরিশ্তারা সে স্থানকে ঘিরে রাখেন। ২। **পবিত্রতা প্রকাশ**। কারণ এই যে, যেখানে ফিরিশ্তারা অবতীর্ণ হন সেখানে সুগন্ধি লাগানোর আদেশ রয়েছে। যেখানে জুমুআর দিনে গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো সুন্নত অর্থাৎ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে যা করেছেন।

এখন আমি মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সব পুণ্যকর্মের কথা বলবো ঃ

(১) ন্যায়-বিচার, (২) অনুগ্রহ, (৩) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (৪) পরিচ্ছন্নতা

পসন্দ করা, (৫) দান করা, (৬) বিশ্বস্ততা, (৭) কার্যত করুণা করা, (৮) বন্ধুত্ব, (৯) সহিষ্ণুতা। এর অর্থ এই যদি কারও কোন ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তার ভাল দিকটি সম্বন্ধে চিন্তা করে তাকে ছেড়ে দেয়া। উপেক্ষা তো এটাই, সে দোষী জানা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়া; কিন্তু সহিষ্ণু অর্থ এই, তার গুণাবলীর কারণে উপেক্ষা করা, **(১০) পরোপকার, (১১) টাকা-পয়সা ধার দেয়া (১২) সদকা, (১৩) সহযোগিতা, (১৪) বিশ্বস্ত হওয়া, (১৫) সন্ধি স্থাপন** অর্থাৎ সন্ধির চেষ্টা করা, **(১৬) উপেক্ষা** অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়া, **(১৭) অঙ্গীকার রক্ষা করা, (১৮) নিম্ন স্তরের লোকদেরকে উন্নতি করে উঠানোর চেষ্টা করা, (১৯) অন্যান্যদেরকে মান-সম্মান প্রদান করা (২০) অন্যদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন** অর্থাৎ বয়স ও মর্যাদায় বড়দের দেখানো, **(২১) লোকেরা ঝগড়া করলে মীমাংসা করে দেয়া। (২২) ভ্রাতৃত্ব (২৩) গোপনীয়তা রক্ষা করা ও (২৪) প্রফুল্লতা।**

এখন আমি অন্যান্য **জীবন-জন্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে সেসব পুণ্যকর্মের কথা** বলছি ঃ

(১) তাদের খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখা, (২) তাদের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের থেকে কাজ নেয়া, (৩) যেসব জন্তু কাজে আসে না তাদেরকেও খাদ্য দেয়া। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- একবার কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং পাখিরা খাবার পাচ্ছিল না। এক ব্যক্তি ওদের খাবার দিলেন। এ কারণে তার ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তিনি বেহেশ্‌তে চলে যান। কুরআন করীমেও এসেছে *ওয়াল্লাযীনা ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুম মা'লুম-লিস্‌সাঈলী ওয়াল মাহ্‌রুম*-আর তারা (ছাড়া) যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্দিষ্ট হক্‌ ও অধিকার, তাদের জন্যেও যারা (সাহায্য) চাইতে পারে এবং তাদের জন্যেও যারা চাইতে পারে না (সূরাতুল মা'আরিজ ঃ ২৫-২৬)। মু'মিনদের এটা একটি গুণ। তাদের ধন-সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে যারা চাইতে পারে আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অংশ রয়েছে। যারা চাইতে পারে না জন্তু জানোয়ার ও পাখিও এদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরও খেতে দেয়া উচিত, **(৪) বোবা পশুদের শীতাতপ এবং এদের যৌন আবেগ এবং এদের শাবকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।**

এখন আমি **জাতীয় পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত সেসব পুণ্যকর্মের বর্ণনা** করব ঃ

(১) যাকাত দেয়া, (২) জাতীয় প্রয়োজনে চাঁদা দেয়া, (৩) অতিথিদের সেবা করা, (৪) জাতির সেবা করা, (৫) সরকারের প্রতি আনুগত্য করা, (৬) সরকারের সাথে সহযোগিতা করা, (৭) দেশের হেফাযত করা,

(৮) দায়িত্বের অনুভূতি, (৯) ভুলের জন্যে আনন্দে শাস্তি মেনে নেয়া, (১০) ভাল কাজের প্রচার অর্থাৎ লোকদের মাঝে পুণ্য বিস্তার দেয়া, **(১১) শত্রু জাতিকে এড়িয়ে চলা, (১২) জাতীয় মান-মর্যাদা সংরক্ষণ করা**। জাতির বিরুদ্ধে যদি কেউ অপমানজনক কথা বলে তাহলে এর প্রতিবাদ করা, **(১৩) ব্যবসায় সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা, (১৪) শিক্ষা দেয়া, (১৫) সচ্চরিত্র গঠন করা**।

এখন আমি **আল্লাহ্‌তাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সব পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে** বলবো ঃ **(১) ঈমানে উৎকর্ষ লাভ করা, (২) ঐশী-প্রেম, (৩) শরীয়তের বিধি-বিধান পালন। ইবাদত ও আচার ব্যবহারে পরিপূর্ণতা লাভ করা. (৪) খোদার নিকট আশা পোষণ করা, (৫) ভীতি** অর্থাৎ খোদাতাআলার পবিত্রতাকে ভয় করা, **(৬) আন্তরিক পবিত্রতা, (৭) ভরসা** অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে পরে সফল হবো, **(৮) উত্তম চরিত্র যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে এর প্রতি দৃষ্টি রাখা যেভাবে অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি, (৯) সর্বপ্রকার মিথ্যা বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, (১০) আল্লাহ্‌তাআলার মর্যাদার** সাথে যদি কেউ বেয়াদবী করে যেমন, কেউ বলে, তিনি আমাকে কী দিয়েছেন, আমার ওপর বড়ই অন্যায় করা হয়েছে তখন তাকে বুঝানো দরকার, এটা খোদাতাআলার সম্মানের পরিপন্থী **এথেকে বিরত থাকো, (১১) সত্যের প্রচার**। আল্লাহ্‌র চিহ্নাবলীর (যা দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়) সম্মান করা।

এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলবো, কোন্ কোন্ উপলক্ষ্যে এসব কর্ম পালন ও পরিত্যাগ করা যায়। এর দু'টি উত্তর। একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তারিত। যদি বিস্তারিত উত্তর দিতে চাই তাহলে সংক্ষিপ্ত করে বল্লেও ১৫/২০ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। এজন্যে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টির মোটামুটি কথাগুলো বর্ণনা করছিঃ

(১) বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র যে সব অধিকার রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ বাধ্য করা না হয় বা খোদাতাআলার অন্য আদেশ এর পথে প্রতিবন্ধক না হয়। যেমন, হাতে বা মুখে আঘাতের কারণে ওযূ করতে পারে না বা হাতই উঠিয়ে ধুতে পারে না। এটা বাধ্যবাধকতা। আর এর বিপক্ষে দ্বিতীয় উদাহরণ এই এসে যায়, খোদাতাআলার আদেশ এই, মহিলারা পর্দা করবে; কিন্তু এটাও খোদার আদেশ, হজ্জের উপলক্ষ্যে খানা কা'বাতে পর্দা উন্মোচন করে দেয়া আবশ্যক। এ দ্বিতীয় আদেশটি প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে আর এ কারণেই খানা কা'বাতে পর্দা না করা পুণ্যের কাজ। অথবা এ উদাহরণ, পিতা-মাতার আনুগত্য করা পুণ্যের কাজ; কিন্তু পিতা-মাতার কোন

আদেশ যদি খোদাতাআলার আদেশের বিরোধী হয় তখন তা না মানাই পুণ্যের কাজ।

(২) অন্যের বেলায় এমন কোন কথা না বলা, সে অবস্থায়ই নিজের জন্যে তা বলা পসন্দ করে না। আমি এতে একটি শর্ত আরোপ করছি আর তা এই, আমি এ কথা বলছি না যে, অন্যের সাথে সেই আচরণ করুক যা সে পসন্দ করে। বরং আমি এ কথা বলি, অন্যের সাথে এমন কোন কথা যেন বলা না হয় যা সেই অবস্থায়ই নিজের জন্যে পসন্দ করে না বা অন্যের সাথে যেন এমন আচরণ না করে যা সেই অবস্থায়ই নিজের জন্যে পসন্দ করে না। ইঞ্জিলের আদেশ এই ঃ তুমি অন্যের সাথে তেমনি আচরণ কর যেভাবে নিজের জন্যে পসন্দ করো। কিন্তু এ আদেশ সঠিক নয়।

(৩) বাড়াবাড়ি না করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। কোন কোন লোক এরূপ হয়ে থাকে হয়তো তারা নফল পড়াই ছেড়ে দেয় নয়তো এতোই পড়া শুরু করে দেয় যে, সংসারের চিন্তাই পরিত্যাগ করে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির প্রসঙ্গে অভিযোগ করা হলো, সে দিনে রোযা রাখে এবং রাত ভর নফল নামায পড়তে থাকে। তিনি (সঃ) তাকে বললেন, ওয়া লি নাফসিকা আলায়কা হাক্কুন অর্থাৎ তোমার আত্মার ওপর তোমার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীরও তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে। তা-ও আদায় করা আবশ্যক।

(৪) মানুষ এমনভাবে যেন সৎকর্ম করে যাতে তার মধ্য দিয়ে খোদাতাআলার গুণ বিকশিত হওয়ার ফলে তেমনি রূপ সৃষ্টি হয়ে যায়।

এখন আমি তৃতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। **মানুষের মাঝে কোন কোন দোষ-ত্রুটি নিহিত রয়েছে তা কিভাবে অবগত হওয়া যাবে**। এটা অবহিত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যমে রয়েছেঃ

(১) **আত্ম-বিশ্লেষণ**। যখন মানুষের এটা জানা হয়ে যায়, এটা ভাল, ওটা মন্দ, তখন সে যদি চিন্তা করে কী কী মন্দ তার মাঝে রয়েছে বা কী কী ভাল তার মাঝে রয়েছে তাহলে জানতে পারে।

(২) নিজের কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলে, সে যেন **তার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে**। কেননা, মানুষ কখনও নিজের ত্রুটি নিজে ধরতে পারে না। এজন্য বন্ধুকে বলে, সে যেন তার বাহ্যিক কর্মগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে। এটা যেন না বলে, তুমি আমার ব্যাপারে দোষ-ত্রুটিগুলোকে বিশেষভাবে অন্বেষণ করো। এটা পাপ। বরং বলে বাহ্যিক কর্ম রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো এবং যে দুর্বলতা পাও সে সম্বন্ধে বলো। এভাবে যেসব দুর্বলতার ব্যাপারে সে জানতে না পারতো ওগুলো সম্বন্ধে তার বন্ধু বলে দিবে। কিন্তু এর পরেও বন্ধু বন্ধুই থাকে। কোন কোন দোষ-ত্রুটি সে-ও এড়িয়ে যাবে।

(৩) এজন্যে তৃতীয় পদ্ধতি এটা অবলম্বন করা উচিত- **যেসব দোষ সে অন্যের মাঝে লক্ষ্য করে থাকে সেগুলোর ব্যাপারে দেখে এগুলো আমার মাঝে আছে কি নেই?** আমি তো আবার সেসব কর্ম করি না? অথবা অন্যদের মাঝে যেসব পুণ্যকর্ম পরিলক্ষিত হয় এগুলোর ব্যাপারে দেখে, ওগুলো আমার মাঝে আছে কি নেই।

(৪) এথেকে বেশি আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে আর তা হলো এই ঃ শত্রু তার প্রতি কি দোষ-ত্রুটি আরোপ করে থাকে এবং পরে চিন্তা করে, সেই দোষ-ত্রুটি কি তার মাঝে আসলেই আছে বা নেই। কোন কোন দোষ-ত্রুটি এভাবে জানা হয়ে যাবে। এভাবে এটাও দেখে আমার মাঝে শত্রুর কাছে এমন কোন্ পুণ্য পরিদৃষ্ট হয়? কখনও কখনও এমন হয়ে থাকে যে, পুণ্যসমূহকে চিনবার জন্যে শত্রুও বাধ্য হয়ে যায়।

(৫) ভাল ও মন্দকে জানার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর উত্তম পদ্ধতি এই, কুরআন করীম তেলাওয়াত করার সময় যেখানে সেসব দোষ-ত্রুটির কথা পাঠ করে যা খোদাতাআলা প্রাথমিক যুগের জাতিগুলোর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সেখানে যেন চিন্তা করে যে, আমার মাঝে সেই দোষ-ত্রুটি তো নেই। এভাবেই কুরআন করীমে যখন কোন পুণ্য কর্মের উল্লেখ আসে সেখানে দেখে আমার মাঝে এ পুণ্য কর্ম পাওয়া যায় কি যায় না। এর একটি কল্যাণ এ-ও হবে, যেহেতু সব পুণ্য ও মন্দকর্ম একই সময়ে মানুষের দৃষ্টিতে আসতে পারে না, এ জন্যে আস্তে আস্তে তেলাওয়াতের সময়ে আসতে থাকবে। দ্বিতীয়বার তেলাওয়াতের সময় যেহেতু আল্লাহ্-ভীতি সৃষ্টি হয় এজন্যে এতে মন্দকর্ম থেকে রক্ষা পেতে এবং পুণ্য অবলম্বন করাতেও সাহায্য লাভ হবে।

জেনে যাওয়ার পরও যেসব মন্দকর্ম পরিহার করতে পারে না সেগুলোর চিকিৎসা ঃ

এসব কথা সেই সব লোকের ব্যাপারে যাদের প্রাণে মন্দকর্মের কারণে মরিচা ধরে নি। কিন্তু কোন কোন লোক এমন হয়ে থাকে, যাদের মন্দকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তো লাভ হয়ে থাকে অথচ তারা পরিহার করতে পারে না। তাদের চিকিৎসা কী? যেমন, এমন সব লোক রয়েছে, যারা অবহিত আছে, নামায না পড়া পাপ তবুও তারা নামায পড়ে না।

এ প্রশ্নের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে ঃ কিন্তু তা এখন বক্তৃতায়ও বলা যাচ্ছে না আর কোন ছোট খাটো পুস্তিকায়ও লেখা যাচ্ছে না। সুতরাং আমি এ প্রশ্নের জবাবে ১০-১৫টি চিহ্ন সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি।

(১) এমন ব্যক্তির বুঝা উচিত, তার অন্তরে মরিচা ধরেছে আর এমন কোন প্রতিবন্ধকা সৃষ্টি হয়ে গেছে যা তাকে পুণ্য করতে দিচ্ছে না এবং মন্দকর্ম করা থেকে রক্ষা পেতেও দিচ্ছে না। আর এ হলো কর্মের পরিহাস অর্থাৎ অতীত পাপের ফল। তার জন্যে প্রথম ব্যবস্থা এই, ইস্তিগফার করে খোদাতাআলার নিকট অতীতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ইস্তিগফারের প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা আবশ্যক, এর অর্থ হলো ঢেকে দেয়া। আর এটা দু'রকমের হতে পারে। এক অবস্থায় তো ইস্তিগফার এ রকম হতে পারে যে, ইস্তিগফার যিনি করেন তিনি বলেন, হে খোদা! সেসব পাপ যা আমি করে ফেলেছি সেগুলো মার্জনা করে দাও, যাতে ধরা পড়ে গেছি তা দূর করে দাও এবং দ্বিতীয় পর্যায় এই হয়ে থাকে, মানুষ বলে থাকে, হে আল্লাহ্ আমার মাঝে যেন পাপ সৃষ্টি না হয়। যখন নবীদের প্রসঙ্গে ইস্তিগফারের বর্ণনা আসে তখন এই অর্থেই হয়ে থাকে যেন পাপ সৃষ্টিই না হয়।

২। দ্বিতীয় পদ্ধতি এই, মানুষের নিজের মাঝে তত্ত্ব-জ্ঞান সৃষ্টি করে। তত্ত্ব-জ্ঞানের অর্থ এই, নিজের প্রাণে ঐশী গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। ঐশী গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে আর ওগুলো আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। যেমন খোদাতাআলার রহমানীয়ত– পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী গুণকে পর্যবেক্ষণ করে দেখে তিনি আমার ওপর কত অনুগ্রহ করেছেন! আর যখন তিনি বলেন, আমার বান্দাদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে দান করো তখন আমি কেনই বা দিবো না। এভাবে খোদাতাআলার গুণাবলীর ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলে অসৎকর্ম থেকে রক্ষা পাবার ও পুণ্য কর্ম করার পারঙ্গমতা সৃষ্টি হবে।

৩। পুণ্য কর্মের পুণ্য পরিণাম ও মন্দ কর্মের মন্দ পরিণামের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয় অর্থাৎ এটা দেখে অমুকের পুণ্য করার ফলে এ কল্যাণ লাভ হয়েছে আর মন্দ কর্ম করার ফলে অমুকের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়।

৪। যখন এ তিনটি কর্মই করা হয় তখন চতুর্থ কাজটিও করে অর্থাৎ তওবা করে। তওবার তাৎপর্য এই, (এক) অতীত পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা, এ অবস্থা অন্তরে সৃষ্টি হয়, (দুই) যেসব অবশ্য-করণীয় কাজ রয়ে গেছে সেগুলো করতে থাকে যেমন, হজ্জে যাওয়া বাকী রয়ে গেছে, তা করে ফেলে। কিন্তু নামায এমনই এক ফরয, যা থেকে গেলে তা পুরো করার আর সুযোগ থাকে না। এ জন্যে ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনাই একটি পথ থেকে যায়, (তিন) কিন্তু যে পাপ খোদাতাআলা ঢেকে রেখেছেন অর্থাৎ যার ওপর খোদা আবরণ দিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া যে পাপের কথা স্মরণ হয় সে ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (চার) তার দ্বারা যাদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে তাদের উপকার করে অর্থাৎ তাদের সাথে

সদ্ব্যবহার করে, (পাঁচ) ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্যে অঙ্গীকার করে, (ছয়) আত্মাকে পুণ্যের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। এগুলো হলো তওবার শর্ত। এগুলো পালন করলে পরে তওবাকে সঠিক অর্থে তওবা বলা যেতে পারে এবং গৃহীত হতে পারে।

৫। মানুষ তাখাল্লাকূ বি আখলাকিল্লাহ্-এর অবস্থা সৃষ্টি করে। নিষ্ঠার বালাই নেই- এ ধারণা যেন পোষণ না করে। বরং নিজ দায়িত্ব মনে করে পুণ্যকর্ম করতে থাকে। যেমন, সদকা, চাঁদা দিতে কষ্ট হলেও দিতেই থাকে বা নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি না হলেও বার বার পড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, মানুষের কর্তব্য এটাই যেন কাজে লেগেই থাকে। সাহস যেন না হারায়। আমি কয়েকবার শুনিয়েছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলতেন-এক শিষ্য তার পীরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো এবং তার নিকট থেকে গেলো। রাতে পীর সাহেব দোয়া করতে থাকলেন, হে আল্লাহ্! অমুক কাজ যেন হয়ে যায়। শেষে বাণী আসলো-এ কাজ তো হবে না। এটা শিষ্যও শুনে ফেল্লো। এর পরে সে আশ্চর্য হয়ে বললো, খুব ভাল পীর সাহেব বটে! আমরা তো তার নিকট দোয়া করাতে আসি। কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে তিনি এ জবাব পান যে, তোমার দোয়া কবুল করা হবে না। এর পর সে চুপ করে থাকলো। দ্বিতীয় দিন এরকমই হলো, পীর সাহেব সারা রাত দোয়া করতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি সেই জবাবই পেলেন। শিষ্য আরো বিস্মিত হলো। তৃতীয় দিনও আবার এ রকমই হলো। শেষে শিষ্য তাকে এ কথাই বললো, তিন দিন থেকে আপনি কোন ব্যাপারে দোয়া করছেন, যে প্রসঙ্গে ইলহাম হতে থাকলো যে, দোয়া কবুল করা হবে না। তাহলে পরে আপনি কেন দোয়া করতে থাকেন? পীর সাহেব বল্লেন, মুর্খ কোথাকার! আমি তো বিশ বছর থেকে এ দোয়াই করে আসছি আর আমার নিকট এই ইলহামই হয়ে আসছে; কিন্তু আমি বিচলিত হই নি। আর তুমি তিন দিন শুনেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছো। আসল কথা এই, কবুল করা বা না করা খোদার কাজ। আর আমার কাজ দোয়া করা। তিনি তাঁর কাজ করছেন আর আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। লেখা আছে-এরপর তখন তখনই ইলহাম হলো, এ পর্যন্ত তুমি যত দোয়া করেছো সব কবুল করা হলো।

অতএব বান্দার কাজ এই, যেন নিজ কাজে নিয়োজিত থাকে। নামাযে যদি একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত না থাকে না থাকুক এটা তার ক্ষমতার বাইরে। তার কাজ এই, সে যেন নামায পরিত্যাগ না করে। কিন্তু কখনও কখনও এমন হয়ে থাকে, যখন মানুষ বাহ্যিকভাবে পুণ্যকর্ম করে তখন এর প্রভাব অভ্যন্তরেও পড়ে থাকে আর মানুষ পবিত্রতা লাভ করে। কিন্তু এভাবেও যদি সফলতা লাভ না হয়, মানুষ

আশা করে কিন্তু তা ভঙ্গ হয়, উঠতে চায় পুনরায় পড়ে যায়, আবার সাহস করে কিন্তু বিফলতার মুখ দেখারই ভাগ্য হয়। এমন মানুষকে দৃঢ়ভাবে বুঝে নেয়া উচিত, তার প্রাণে অনেক মরিচা ধরে গেছে আর তা দূর করার জন্য ব্যাপক চিকিৎসা প্রয়োজন। কেননা, তার ওপর কুপ্রবৃত্তি জয় লাভ করেছে আর সে পরাজিত হয়েছে। আর সেই আত্ম-অহমিকার শিকার হয়ে গেছে, যার ওপর আমার গতকালের পঠিত নযমে ইঙ্গিত রয়েছে। সে ধ্বংস হয়ে গেছে আর সে সেই পশুর ন্যায় হয়ে গেছে যার নাকে মানুষ শিকল লাগিয়ে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে গিয়ে থাকে। তার কু-প্রবৃত্তি তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তার জন্যে তো প্রথমে সাধারণ চিকিৎসা। পরে ব্যাপক নীতিগত চিকিৎসা সম্বন্ধে বলছি। আমি এ ব্যাপারে আপাতত কিছু বলবো। চারিত্রিক দর্শন সম্বন্ধে আগে যা মনে করা হতো আর আহমদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এখন যা মনে করা হচ্ছে এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি। মুসলমানদের মাঝে চারিত্রিক দর্শনের প্রবর্তক হলেন ইবনে মারদাওয়াইয়াহ্ (রহঃ)। তিনি এর ওপর একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। আর পরে ইবনে আরাবী (রহঃ)-কে সবচে' বড় শিক্ষক মনে করা হয়ে থাকতো। এর পরে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর নাম আসে। তিনি চরিত্রের ওপরে ৪ খন্ডের একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর পরে আর কোন পুস্তক লেখা হয় নি। আর এটা মনে করে নেয়া হয়েছে যে, চারিত্রিক দর্শনের বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এ কারণে আমি এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই যেন সেসব লোক যারা এ দর্শনের পুস্তকখানা পাঠ করেছেন, তাদের নিকট এতে নিহিত ভুল-ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে সেসব কথা তাদের সময়ে উত্তম ছিলো কিন্তু এখন অচল হয়ে গেছে।

ইমাম গাজ্জালীর দর্শন ও আহমদী দর্শনের মাঝে পার্থক্য এই, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) নেতিবাচক গুণের ওপর বড়ই জোর দিয়েছেন। আহমদী চারিত্রিক দর্শন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম প্রবর্তন করেছেন। তিনি এতে পরিবর্তন সাধন করেছেন। কেননা, তিনি ইতিবাচক গুণের ওপর জোর দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন, চরিত্র একে বলে না যে, এটা যেন হয় ওটা যেন না হয় বরং এটা দ্বারা বুঝায় এটা হয়েছে ওটাও হয়েছে।

এতে সন্দেহ নেই, আত্মাকে কষ্ট দেয়াও একটি চিকিৎসা পদ্ধতি; কিন্তু তা চিকিৎসার অন্যতম, ওটা একমাত্র চিকিৎসা কিনা এটা বিচার্য বিষয়। আমরা চারিত্রিক দর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কথাও বিস্মৃত হতে পারি না। প্রথমত খোদাতাআলা বলেন, *ওয়ামা খালাক্কতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা* লিইয়্যাবুদূন অর্থাৎ আমরা কেবল মানবকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন সে ইবাদত

তৃতীয় কথা, যা আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারি না তাহলো, আত্মা নিয়ন্ত্রণে আসার ফলেই পাপ সৃষ্টি হয় না বরং আত্মার মরে যাওয়াতেও সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, অনাত্মাভিমান। এটা আত্মার বিনাশ সাধনে সৃষ্টি হয়। এমন সময় তো এটা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন আত্মার শক্তি সৃষ্টি করা হয় যেন তা এমতাবস্থায় কার্যকর হতে পারে।

মোটকথা যেভাবে কাজ নেবার জন্যে ঘোড়াকেও কখনও কৃশ বানানো হয়ে থাকে আর কখনও মোটা, এমন অবস্থা আত্মারও। একে একেবারেই মেরে ফেলা উচিত নয় আর কোন কথাই মান্য করে না এমন বিদ্রোহীও বানানো উচিত নয়। চারিত্রিক দর্শনের প্রসঙ্গে ইমাম গায্যালী (রহঃ) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বর্ণিত পদ্ধতিতে এটা একটি পার্থক্য। তিনি (আঃ) এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমানের ভিত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর। কুরআন করীমে এসেছে, আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি ঈমানের অবস্থান; কিন্তু একথা বলা হয় নি আশা আর নিরাশার মাঝখানেই ঈমানের অবস্থান। নৈরাশ্যের প্রসঙ্গে তো এতটা বলা হয়েছে, *ইন্নাহু লা ইয়াইয়াসু মির্ রওহিল্লাহি ইল্লাল কৃত্তমিল কাফিরূন* অর্থাৎ কাফিররাই নিরাশ হয়ে থাকে। মু'মিন নিরাশ হয় না। তাই ঈমানের দর্শন আশার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর হাদীসে এসেছে - যেভাবে বান্দা ধারণা করবে সেভাবেই খোদা তার সাথে ব্যবহার করবেন। সুতরাং এমন কোন পদ্ধতি যাতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয় একে ইসলাম বলা যায় না। কিন্তু ভীতির বেলায়ও এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক, যেন তা আশার চেয়ে কম হয় আর আশা ভীতির তুলনায় অধিক হয়। নিঃসন্দেহ ভীতি ঈমানের অংশ কিন্তু আশার চেয়ে কম। খোদাতাআলা বলেন, রহমাতী ওয়াসী'আত কুল্লা শায়ইন অর্থাৎ আমার কৃপা গুণ ক্রোধ গুণের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। এথেকে জানা গেল, বান্দার প্রাণেও ভীতি থেকে আশার সঞ্চার অধিক শক্তিশালী হওয়া দরকার।

মু'মিনের প্রাণ আশায় ভরপুর থাকে। নিঃসন্দেহে তাতে ভীতিও নিহিত থাকে, কিন্তু তা কম। সে মনে করে, আমি বিনাশপ্রাপ্ত হই খোদাতাআলা আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করবেন না। আমরা যদি মু'মিনদের ভীতি ও আশার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে সুস্পষ্টভাবে এটা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তার ভীতি খোদাতাআলার প্রতি কু-ধারণার ফলে হয় না বরং স্বীয় দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু তার আশা খোদাতাআলার আশিসের কারণে হয়ে থাকে। এখন আমাদের দুর্বলতা খোদাতাআলার আশিসের তুলনায় যে নগণ্য এটা কি সত্যি নয়? তাই মু'মিনের ভীতি যদি খোদাতাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর কৃপা তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ওপর বিজয়ী আর নিজের

দুর্বলতার প্রতি যদি দৃষ্টি রেখে হয় তখন খোদাতাআলার শক্তি আমাদের দুর্বলতার ওপর বিজয়ী। সুতরাং যা-ই হোক আশার বিষয়টিই বিজয়ী থাকলো। কেননা, এর (অর্থাৎ আশার) সঞ্চারক ভয়-ভীতির সঞ্চারক থেকে সব দিক দিয়ে শক্তিশালী।

কিন্তু এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক, আশা আনুগত্যকারীর জন্যে বিদ্রোহীর জন্যে নয়। কোন মানুষ এটা যেন না বলে, যা খুশী তা-ই করবো আবার আশাও রাখবো যে, খোদাতাআলার কৃপার যোগ্য হয়ে যাবো। এটা বিদ্রোহিতার শামিল। আর বিদ্রোহীর জন্যে কোন আশা-প্রত্যাশা থাকতে পারে না। আশা আনুগত্যকারীর ভাগ্যেই জুটে।

দ্বিতীয় এ কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক, মু'মিনের ভীতির কারণ এটা নয়, সম্ভবত এটা না-ও হতে পারে বা এমনটি না করলে শাস্তি পাবো বরং তার এ ভীতি এজন্যে হয়ে থাকে, যে পথে আমি চলছি এ পথে চলে সম্ভবত (সফলতা) না-ও হতে পারে। এভাবে ভয়ের কারণ এটা নয় যে, এ কাজ না করলে তো খোদাতাআলা শাস্তি দিবেন বরং এটা হয়ে থাকে, সম্ভবত আমি খোদাতাআলার কৃপাকে আকর্ষণ করতে পারবো না।

মোটকথা আসল ইসলামী সূফীবাদের ভিত্তি আশা ও ভীতির ওপর। আর আশার বিষয়টি ভীতির তুলনায় ভারী। সত্য এটাই, ইতিবাচক শক্তি আশা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ভীতি থেকে নেতিবাচক শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মোট কথা আসল উদ্দেশ্য খোদাতাআলার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করা আর তা আশায়ই সৃষ্টি হয়। ভয়-ভীতি দ্বারা কেবল পাপ দূরীভূত হয়ে থাকে। দেখো, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিভাবে স্বীয় উম্মতকে ভয়-ভীতি দূর করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত তো কুরআন করীমের *রহমাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শায়ইন*-আয়াতে জানা গেল, খোদাতাআলার কৃপা সব বস্তু থেকে অধিক। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সতর্ককারী স্বপ্ন শয়তানী হয়ে থাকে আর সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন খোদাতাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যেহেতু মানুষের আত্মার ওপর স্বপ্নের খুবই প্রভাব পড়ে থাকে এজন্যে তিনি (সঃ) এটা বলে দিয়েছেন, সতর্ককারী স্বপ্নগুলোতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই সতর্ককারী স্বপ্ন নবী (আঃ)-গণও দেখে থাকেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা এটা বুঝায় না, প্রত্যেক সতর্ককারী স্বপ্ন শয়তানী হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ এই, খুব বেশি বেশি সতর্ককারী স্বপ্ন যদি দেখা হয় এবং সুসংবাদ সম্বলিত স্বপ্ন দেখাই যায় না

বা খুব কম দেখা যায় তখন ওগুলোকে শয়তানী স্বপ্ন মনে করা উচিত। এভাবে তিনি (সঃ) মু'মিনদের অন্তরের ভীতি দূরীভূত করে দিয়েছেন। কেননা, মানুষের হৃদয়ে স্বপ্নের প্রভাব বিশেষভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এমন ব্যক্তি যারা শয়তানী স্বপ্ন দেখে থাকে তাদের বেলায় এটা হতে পারে তারা সত্য-স্বপ্নও দেখতে পারে এবং তারা এটাকে শয়তানী মনে করে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তাই তাদেরকে এরও চিকিৎসার কথা বলে দিয়েছেন। যখন ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায় তখন মু'মিনদের বামদিকে থু থু নিক্ষেপ করা এবং 'লা হাওলা' পাঠ করা আবশ্যক। এতে কি আশ্চর্য বিষয়ই না তিনি (সঃ) বর্ণনা করেছেন! লোকেরা কোন বিষয়ে কেন থু থু নিক্ষেপ করে? এ জন্যে যে, আমি এতে ভ্রুক্ষেপও করি না। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শয়তানী স্বপ্নের ব্যাপারে মু'মিনদের মনে সাহস যুগিয়েছেন। যখন এরূপ স্বপ্ন দেখো তখন এই বলে থু থু নিক্ষেপ করো, আমি এতে ভ্রুক্ষেপও করি না। এ পদ্ধতিতে তিনি (সঃ) আশা ও সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় 'লা হাওলা' পাঠ করতে বলেছেন। কেননা, যেভাবে ওপরে বলা হয়েছে, এসব স্বপ্নে কোন সত্য-স্বপ্নও নিহিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব 'লা হাওলা' (লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল 'আলিয়িল 'আযীম-অর্থাৎ সেই মহান উচ্চ আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী কেউ নেই-অনুবাদক) পাঠ করা দ্বারা খোদাতাআলার সন্নিধানে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও তাঁর সত্তার ওপর ভরসার সুযোগ লাভ হবে। মোটকথা থু থু নিক্ষেপ করা দ্বারা স্বপ্নের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আর 'লা হাওলা' পাঠ করার ফলে ঐশী-ভীতির প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কেননা, যে-ব্যক্তি খোদাতাআলার সমীপে নিজেকে সমর্পণ করে সে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং যে-ব্যক্তি এ উভয় চিকিৎসা অবলম্বন করবে তার মন থেকে ভীতি দূরীভূত হয়ে যাবে। দেখো, কেমন সূক্ষ্ম ও উত্তমভাবে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের ওপর থেকে ভীতির আধিক্য দূরীভূত করেছেন।

গাযালী ও আহমদী চারিত্রিক দর্শনের পার্থক্য বর্ণনা করার পর এখন আমি সেই আধ্যাত্মিক রোগীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করবো যার সৎকর্ম খুবই কম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এসব চিকিৎসার কথা বলার আগে আমি এ সংশয় দূর করে দেয়া আবশ্যক মনে করি, এমন মানুষের জন্যে আরও কোন কোন কর্ম সম্বন্ধে বলাতে কি উপকার হতে পারে? কেননা, প্রথমেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, তার দ্বারা সৎকর্ম হতেই পারে না। এমতাবস্থায় বাড়তি পুণ্যকর্মের কথা বলাতে কী উপকার হতে পারে? সুতরাং এর জবাব এই ঃ ১। যতক্ষণ পুণ্যকর্ম করা মানুষের জন্যে

অসম্ভব না হয়ে যায় ততক্ষণ পুণ্যকর্ম করা ছাড়া তার কোন লাভ হতে পারে না। অবশ্য তার জন্যে সৎকর্ম করা যদি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো সৎকর্ম ছাড়াও পবিত্রতা দূর হতে পারে; যতক্ষণ সৎকর্ম করা তার জন্যে সম্ভব ততক্ষণ সৎকর্ম ছাড়া পবিত্রতা সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং সৎকর্ম করা যদি অসম্ভব হয়ে যায়, যেভাবে কেউ পাগল হয়ে গিয়ে সৎকর্ম করতে পারে না, তখন তার ব্যাপারে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাকে পরে সুযোগ দেয়া হবে।

অবশ্য এটা মনে রাখা উচিত, সৎকর্ম দু'রকমের হয়ে থাকে। একটি সর্বাবস্থায় লোকের জন্যে সম্ভব। আর একটি অন্তরের কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা সম্ভবপর হয়। যে কর্ম কোন কোন অভ্যন্তরীণ অবস্থায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো আবেগ ও ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু যে-কর্ম বাহ্যিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত তা কোন অবস্থাতেই অসম্ভব হয় না যেমন নামায এর ব্যাপারে কেউ এটা বলতে পারে না, আমি নামায পড়তেই পারি না। কিন্তু এটা বলতে পারে অবৈধ ভালবাসা আমার মন থেকে বের করতেই পারি না। সুতরাং কর্ম দু'প্রকারের। একটি আবেগের সাথে সম্পর্ক রাখে আর অন্যটির সম্পর্ক আবেগের সাথে থাকে না।

এখন দেখো শারীরিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা কিভাবে হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি ডাক্তারের নিকটে যায়। সে বড়ই দুর্বল। কোন কাজ করতে পারে না। তাকে বলা হয় ব্যায়াম কর। এখন কি সে এটা বলতে পারে, আমি তো আগে থাকতেই কাজ করতে পারি না আর আপনি কিনা ব্যায়াম করতে বলছেন। সে এটা বলে না। কেননা, অন্য কাজে আর ডাক্তার কর্তৃক বর্ণিত কাজে পার্থক্য রয়েছে। আর তা এই, ডাক্তার কর্তৃক যা কিছু বলা হয় যদিও তা কাজ, তবুও তা সাধ্যাতীত নয়। আর অন্যটি তার শক্তির বাইরের কাজ। সুতরাং শক্তি সৃষ্টি করার জন্যেও একটি কর্ম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এমন এক দুর্বল ব্যক্তি, যে উঠে দাঁড়াতেই পারে না, চৌকির ওপর শুয়ে থাকে তার ব্যাপারে ডাক্তার এটাও বলবে, মালিশ করতে থাকো। এতে কিছু শক্তি সৃষ্টি হলে পরে বসতে পারবে। তার আরো শক্তি সৃষ্টি হলে তখন দাঁড়াতে পারবে।

একথা আধ্যাত্মিক কর্মেও রয়েছে। ছোট ছোট সৎকর্মে নিয়োজিত করে ওপরে উঠানো হয়ে থাকে। একটি বালক যে বলে, আমার দ্বারা দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়া সম্ভব নয়। তাকে বলা হবে, তবে নবম শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়ো। এর ব্যাপারে সে একথা বলতে পারে না, যখন আমার দ্বারা দশম শ্রেণীর পাঠ্য পড়া সম্ভব নয় তখন নবম শ্রেণীর পাঠ্য কিভাবে পড়বো? এভাবে আধ্যাত্মিক

অঙ্গনে ছোট ছোট সৎকর্মে উন্নতি করতে করতে বড় বড় সৎকর্মে পৌঁছে যাওয়া যায়।

প্রথমে বর্ণিত চিকিৎসাগুলো বাদেও এরূপ ব্যক্তির জন্যে এমন আরো কোন কোন বিষয় আবশ্যক হয়ে থাকে যেগুলো পরে বর্ণনা করবো। প্রথম চিকিৎসা এই ঃ

১। এক ব্যক্তি সৎ ও অসৎ কর্মসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, ২। এগুলোর যথাসম্ভব প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, ৩। আত্ম-বিশ্লেষণ করে, ৪। অধিক সংখ্যায় ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, ৫। খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। এর আগে আমি বলেছিলাম, খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করো। কিন্তু এখানে এটা বলছি তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করো। কেননা, যে সৎকর্ম করার পূর্ণ শক্তি রাখে না, তার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

৬। সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করে।

৭। তাখাল্লাকূ বি আখলাকিল্লাহ্- আল্লাহ্তাআলার গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে।

এরপর যে চিকিৎসার কথা আলোচনা করবো তা নীতি-বিষয়ক। এমন ব্যক্তির প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই যে, তার ব্যাধি আছে। আর ব্যাধির চিকিৎসা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া হতেই পারে না। তার জন্যে আবশ্যক তার কী ব্যাধি আছে তা সে জ্ঞান-ভিত্তিতে জেনে নেয়। এজন্য সে প্রথমে মনে মনে এ প্রশ্ন করে সে কী বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? এর প্রথম জবাব এইঃ অন্তরের পবিত্রতার জন্যে। আর দ্বিতীয় কর্মের সংশোধনের জন্যে। প্রথম বিষয়টি খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কিত। আর মনের দুর্বলতার অর্থ এই, যথার্থ ভালবাসার বীজ বিলুপ্ত হয়েছে। আমি কয়েকবার আমার একটি স্বপ্নের কথা শুনিয়েছি। আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি ছাদের চত্তরে দাঁড়িয়ে শিশুর মত আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর থেকে আমি হযরত মরিয়মকে অবতরণ করতে দেখি। তিনি ওপরের চত্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরে সেখান থেকে তিনি এক ধাপ নিচে নেমে এলেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ওপরের দিকে এক ধাপ আগালেন। হযরত মসীহ্ (আঃ) তাঁর দিকে ঝুঁকলেন আর মরিয়মও তাঁর দিকে ঝুঁকে গেলেন। এ সময়ে আমার মুখে একথা প্রবাহমান হয়ে গেলো Love creates love অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসা জন্ম দেয়। সুতরাং ভালবাসা ভালবাসা থেকেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু **ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্যেও উপকরণ** রয়েছে আর তা হলো এই ঃ

১। সৌন্দর্য ২। অনুগ্রহ। এখন আমরা দেখতে পাই, এক ব্যক্তি খোদাতাআলার সৌন্দর্যও দেখলো অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর ওপরে চিন্তা করলো এবং অনুগ্রহও দেখতে পেলো। নিজের সাথে খোদাতাআলার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দিলো, কিন্তু এরপরও তার প্রাণে ভালবাসার সৃষ্টি হলো না। এথেকে জানা গেলো, তার অবস্থা সেই শিশুটির ন্যায় যে তার মাকে ভালবাসে না আর ভালবাসার বীজ তার মাঝে বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেভাবে এক ব্যক্তির পেটে খাবার প্রবেশ করে না আর ঔষধও না; তখন জানা যায়, তার পাকস্থলী অকেজো হয়ে গেছে। এর জন্যে পাকস্থলীকে শক্তিশালী করা প্রথম কাজ হওয়া আবশ্যক আর আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারেও এ চিকিৎসাই রয়েছে। তার অনুভূতিসমূহকে প্রথম জাগ্রত করা উচিত। সুতরাং এমন মানুষের জন্যে প্রথম চিকিৎসা এইঃ যেহেতু বাহ্যিক প্রভাব অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করে সে বাহ্যিকভাবে খুশূ' ও খুযূ' (ভয়-ভীতি ও আকুতি মিনতির অবস্থা) অবলম্বন করে। নামায পড়লে কান্নার অবস্থা সৃষ্টি করে, অভিনয় করেই থাকুক না কেন। কোন কোন কাজ অভিনয় ও কৃত্রিমভাবেই যদি করা হয় তাহলে এর প্রভাব অভ্যন্তরে গিয়ে পড়ে। আমি আমেরিকার একখানা পুস্তক পাঠ করেছি। একজন প্রফেসর ছাত্রাবস্থায় খুবই মেধাবী ছিলেন। শেষে তাকে এক কলেজের প্রিন্সিপাল বানিয়ে দেয়া হলো। অথচ তখন তিনি খুবই অযোগ্য প্রমাণিত হলেন। তিনি এর কারণ একজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রাণে এতই কোমলতা রয়েছে, যে কারণে তুমি প্রশাসনকে সঠিকভাবে চালাতে পারো নি। তিনি এর চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি (বিশিষ্ট বিজ্ঞানী) বল্লেন, তুমি তোমার দাঁত ও চোয়ালকে খিঁচে রাখবে। অর্থাৎ মুখকে শক্ত করে বন্ধ করে রাখবে যদ্বারা রাগান্বিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি এমনই করলেন এবং কিছুদিন পরে তার মাঝে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হলো যে, দেশে মশহুর ও বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সবচে' কঠোর প্রিন্সিপাল তিনিই আর তিনি খুবই ভাল প্রশাসক বলে প্রমাণিত হলেন।

অতএব বাহ্যিক প্রভাব অভ্যন্তরে গিয়ে পড়ে থাকে। যে-ব্যক্তি কাপুরুষ আর সে যদি দাম্ভিক হয়ে চলে তাহলে তার মাঝেও সাহস ও বীরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। সৈন্য বিভাগের সিপাহীদের দ্বারা এমনি করা হয়ে থাকে। তাদের দিয়ে অনুশীলন করানো হয়ে থাকে যেন শির উঁচু করে বুক টান করে চলে। এতে তাদের মাঝে বীরত্ব সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রথম চিকিৎসা এই ঃ কোন ব্যক্তির মাঝে যে ক্রটি সৃষ্টি হয় এর মোকাবেলায় সে যেন অভিনয়ের কৌশল অবলম্বন করে। এর ফল এই হবে, তার মাঝে আসলেই সেই গুণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। ভালবাসার উপকরণ সৃষ্টি

করার জন্যে মানুষ বাহ্যিক ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করে যেমন কারো সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করা হয় তো খুব চেপে ধরে আর হৃদ্যতার সাথে করে। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বসে। যখন সে উঠতে যায় তখন যদিও তার মনে এটা চায় যেন সে চলে যায় তবুও আরো বসার জন্যে ভদ্রতা দেখায়। অতএব যখন সে বাহ্যিকভাবে ভালবাসার প্রকাশ দেখায় তখন তার মাঝে আস্তে আস্তে প্রকৃত ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আবার সে খোদাতাআলার সাথেও ভালবাসা সৃষ্টি করতে লেগে যাবে। কেননা, এর আগে তাঁর সাথে ভালবাসা না করার কারণ ছিল এই, তার মাঝে ভালবাসার আবেগ-উদ্দীপনাই ছিলো না।

এছাড়াও দ্বিতীয় প্রতিকার এই, মা-বাবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে ভালবাসার আধিক্য সৃষ্টি করে। এটাই সেই চিহ্ন যাকে বলে ইশ্‌কে মাজাযী বা কৃত্রিম ভালবাসা। সূফী সাধকরা একে কৃত্রিম ভালবাসা আখ্যায়িত করেছিলেন যে, যার সাথে ভালবাসা করা বৈধ তার সাথে ভালবাসায় আধিক্য সৃষ্টি করা হয়; কিন্তু পড়ে একে বিকৃত করে অন্য কিছুতে পরিণত করা হয়েছে। এক ব্যক্তি কোন সুন্দর বালককে অন্বেষণ করুক ভালবাসার অর্থ এই নয়। কৃত্রিমতাকে ভালবাসতে থাকে আর এ ধরনের অবৈধ ভালবাসায় লিপ্ত হয়ে যায়, বরং তা এই, যেসব আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করা বৈধ তাদেরকে যেন বেশি বেশি ভালবাসে। এভাবে তার মাঝে ভালবাসার আবেগ অধিক সৃষ্টি হবে আর পরে খোদাতাআলার সাথেও ভালবাসার আবেগ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় বিষয় যার জন্যে নিজ আধ্যাত্মিকতার সংশোধন করার উদ্দেশ্যে মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় তা হ'ল কাজ-কর্মের সংশোধন। এজন্যে স্মরণ রাখা আবশ্যক, প্রত্যেক কর্ম ইচ্ছা-শক্তির ফলে হয়ে থাকে। মানুষ ইচ্ছা করে, এভাবে করা উচিত পড়ে অন্যভাবে করে নেয়। কিন্তু যে-ব্যক্তি বলতে থাকে, আমার অমুক কাজ করা উচিত; কিন্তু করতে পারে না তখন তার এ **ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে**। হয়ত তার মাঝে ঃ

১। ইচ্ছার ওপর প্রবল হওয়ার সামর্থ্য নেই। মানুষের মাঝে যে 'আমিত্ব' (Ego) আছে তা দুর্বল হয়ে গেছে। এ কারণেই সে ইচ্ছার ওপর শাসক হতে পারে না। 'আমিত্ব' হচ্ছে কর্তা বা প্রভু আর ইচ্ছা-শক্তি হচ্ছে দারোগা। কর্তা দুর্বল হয়ে গেছে এবং সে দারোগাকে এটা বলতে পারে না, এ কাজ করো বরং তাকে ভয় পায়। এ কারণে দারোগা কাজ-কর্মে শিথিল হয়ে যায়।

২। অথবা অবস্থা এই যে, 'আমিত্ব' সুদৃঢ় কিন্তু দারোগা অসুস্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। আর সে আবেগের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হয় নি। আবেগ দারোগা অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তির মাধ্যমে কর্মচারীতে

রূপান্তরিত হয়েছে। যখন দারোগা অসুস্থ হয়ে যায় তখন কর্মচারী অলস হয়ে যায়। তার আদেশ পালন করে না। যেন এভাবে 'আমিত্ব' এবং উদ্দেশ্যসমূহে যে সংযোগ ছিলো তা শিথিল হয়ে গেছে।

৩। এ-ও যদি না হয় তাহলে এ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, এমন কোন জিনিস ইচ্ছা ও আবেগের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তবুও ইচ্ছা-শক্তি আদেশ দেবার সামর্থ্য তো রাখে এবং অনুভব-শক্তি মানতেও প্রস্তুত; কিন্তু এর মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, আবেগ অনুভূতি পর্যন্ত আদেশ পৌঁছতে সক্ষম নয়।

অতএব পাপ বা পুণ্যকর্ম কম হবার এ তিনটি কারণ হয়ে থাকে, অর্থাৎ ১। আমিত্বের দুর্বলতা ২। ইচ্ছা-শক্তিতে দুর্বলতা, ৩। আরও কোন কোন বিষয়ের অনুপ্রবেশ অনুভূতিকে ইচ্ছার কবল থেকে বের করে দেয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ অভ্যাস। এক ব্যক্তির হুকো পান করার অভ্যাস। সে ইচ্ছা পোষণ করে, হুকো পান করবে না। যখন সম্মুখে হুকো দেখে তখন কিছুই করতে পারে না এবং অভ্যেসের কারণ বাধ্য হয়ে পান করে নেয়।

এখন আমি সেই বিষয় বলছি যাতে আমিত্ব ও আন্তরিকতা বেড়ে যায় এবং **মানুষের ইচ্ছা শক্তিশালী হয়ঃ**

১। প্রথম বিষয় যা **আমিত্বকে শক্তিশালী করে তা স্থায়ীত্বের শক্তি** অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত থাকার কামনা। প্রত্যেক জিনিসে এ কামনা-বাসনা লক্ষ্য করা যায় যে, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। একটি সাধারণ কীটকে প্রহার করে দেখবে সে এদিক-সেদিক যায়। এটা এ কথার প্রমাণ, সে-ও জীবিত থাকতে চায়। সেই মানুষ যার মাঝে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায় তার দৃষ্টি রাখা উচিত, আমারই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে তো আমি মৃত অথচ আমাকে তো জীবিত থাকতে হবে। এ জন্যে স্থায়িত্ব লাভের শক্তি সুদৃঢ় করো। এটা একটি দৈহিক চাহিদা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা বাড়ানো যেতে পারে। সুতরাং এটা দেখে নাও না কেন। একজন হুকো সেবনকারী হুকো দেখেই তার নিকট গিয়ে বসবে। মদ্যপায়ী মদ দেখে তার দিকে দৌড়াবে; কিন্তু কেউই তরবারী নিয়ে যদি সেখানে তাকে মারতে আসে তখন দেখো সে কিভাবে পালিয়ে যায়! কথিত আছে, মদ্যপায়ীকে জুতো মারা হলে তার নেশা দূরীভূত হয়। স্থায়ীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিজয় লাভের ফলস্বরূপ নেশা দূর হয়ে যায়।

২। **বিলীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করে নাও**। এ চাহিদা প্রথম চাহিদার আবশ্যিক ফলস্বরূপ। বিলীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে যতক্ষণ সুদৃঢ় না করা হয় ততক্ষণ স্থায়ীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে না। কারও বিলীন হওয়ার

আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ চিন্তা করা উচিত, যে জিনিস আমার উদ্দেশ্যগুলোর প্রতিবন্ধক হবে আমি ওগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো।

৩। তৃতীয় মাধ্যম হলো **আমিত্ব বৃদ্ধি ও আকর্ষণী শক্তিকে সুদৃঢ় করা।** এমন মানুষ চিন্তা করে যেসব বস্তু আমার প্রয়োজন তা আমি অবশ্যই নেবো। যেসব জিনিস লাভ করা কষ্টসাধ্য মনে হয় এ সবের ব্যাপারে মনে এ অনুভূতি ও আবেগ বারে বারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ থেকে আমিত্ব জয় লাভ করবে।

৪। **প্রতিরোধ ক্ষমতার শক্তিকে সুদৃঢ় করা**। অর্থাৎ এটা মনে করা, যেসব জিনিস ক্ষতিকারক হবে আমি সেগুলোর মোকাবেলা করবো।

৫। **অধ্যবসায়-শক্তিকে সুদৃঢ় করা**। এতেও আমিত্ব সৃষ্টি হয়। অধ্যবসায় কখনও কখনও কষ্টকর হয়ে থাকে। আর কারও কারও জন্যে তা অসম্ভব। কিন্তু কোন কোন লোক এ ব্যাপারে অমনোযোগিতাও দেখায়। তারা বলে, বেশ এটাকে ছেড়ে দাও। এ অভ্যাস থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, মানুষ কোন কোন ব্যাপারে অধ্যবসায় দেখালে অন্যান্য ব্যাপারেও অধ্যবসায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর এভাবে আমিত্বের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৬। **বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতা**- এ-ও স্থায়ীত্বের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিচক্ষণতা হলো সময় বুঝে কাজ করা। এতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা-কৌশল সমুন্নত থাকে আর নিজ আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং আমিত্বে উৎকর্ষ লাভ হয়।

৭। **সাবধানতা, সতর্কতা, চৌকষ থাকা, দূরদর্শিতা**- এসব বিষয়কে অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এতেও আমিত্ব উৎকর্ষ লাভ করে।

৮। **আত্ম-প্রশংসাকে ঘৃণা করা উচিত**। কেউ যদি করে তাহলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। এতেও আমিত্ব উৎকর্ষ লাভ করে। প্রশংসা আমিত্বকে ধ্বংস করে দেয় আর খুবই তীক্ষ্ণ ছুরি বিশেষ যা একে খুন করে দেয়। দেখো, কুরআন করীমে কত সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। খোদাতাআলা বলেন, *ওয়া ইউহিব্বুনা আঁইউহমাদূ বিমা লাম ইউফ'আলু* (সূরাতুন নিসা ঃ ১৮৯)। এমন কোন কোন লোক আছে তারা তা পসন্দ করে যে কাজ তারা করে নি অথচ ওগুলোর ব্যাপারে তাদের যেন প্রশংসা করা হয়। এর উদ্দেশ্য এই, এমন সব লোক সেই কথা মানে যেসব লোক তাদের ব্যাপারে বলে অথচ তারা নিজেদের ব্যাপারে এটা চিন্তাও করে না যে, তারা কি আদৌ কোন কাজ করেছে না করে নি। অর্থাৎ এসব লোক নিজেরা কাজ করে না। অল্প স্বল্প যা কিছু কাজ হয়ে যায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় আর অন্যেরা যে বলে, তোমরা এ কাজ করেছ একে স্বীকার করে নেয়, হ্যাঁ, আমরা এমনটিই করেছি। যেন অন্যদের প্রশংসা তাদের জন্যে স্বপ্নের মহল তৈরী

করে দেয় আর এতে এমন ধরনের লোকেরা বসবাস করে থাকে। অতএব প্রশংসার প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে আমিত্ব সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

৯। নবম প্রতিকার **আত্ম-সম্মান বোধের শক্তি সৃষ্টি করা**। অর্থাৎ মানুষ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও লজ্জা শরম সহ্য করতে অস্বীকার করে। বলে, আমার প্রতি দোষারোপ কেন হবে? এতে তার মাঝে আত্ম-মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সে উঠে দাঁড়ায় আর ইচ্ছা-শক্তির বলে কাজ করে ফেলে।

১০। দশম প্রতিকার **মর্যাদা** অর্থাৎ যেসব কথা তোমার সম্পর্কিত নয় তাতে হস্তক্ষেপ করো না। প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করাকে ছেঁচড়ামি বলে। আর এতে আমিত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

১১। একাদশ প্রতিকার হলো **আশা**। নিজের মাঝে এর শক্তিকে বৃদ্ধি করো। এতে নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। মানুষ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এমন হয়ে যাবে। এতে নিজের উপরে আস্থাবান হওয়ার শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়।

১২। দ্বাদশ প্রতিকার হলো **প্রফুল্লচিত্ততা**। এতে মানুষের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে আর বিষন্নচিত্ততায় শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

এগুলোর মাঝে বহু বিষয় এমনই যা খুবই কঠিন কিন্তু কেউ কোন কোনটির ওপর আমল করলে তার মাঝে শক্তি সৃষ্টি হতে আরম্ভ হবে। এসব বিষয়াদি মেধা-সংক্রান্ত এবং এগুলোর অনুশীলনে মানুষের মেধা-সংক্রান্ত শক্তি বিকশিত হতে পারে, এমন কি ইচ্ছা-শক্তি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এগুলোকে প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি এই, মানুষ মানুষের এ যোগ্যতা সম্পর্কে চিন্তা করে, যে সম্বন্ধে আমি বলে এসেছি আর এতে কয়েকদিনের মাঝেই সেই উচ্চ স্তরের মর্যাদা সে নিজের মাঝে নিজ ব্যক্তিত্বের শক্তি অনুসারে বৃদ্ধিশীল দেখতে পাবে।

কিন্তু কখনও এমনও হয়ে থাকে, আমিত্ব সীমাতিরিক্ত হয়ে যায় আর তাতে পাপ সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। যেমন, একজন অত্যাচারী মালিক অহেতুক তার চাকর-বাকরদের মার-ধর করতে থাকে। এমতাবস্থায় এর প্রতিকার খোদাতাআলার অভাবমুক্ততা ও বেপরওয়া গুণের বিষয় চিন্তা করা। মানুষ চিন্তা করে, আমার আমিত্ব এভাবে প্রত্যেক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে গেলে খোদাতাআলাও যদি আমার সাথে এমন ব্যবহারই করেন তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? তার আরো চিন্তা করা উচিত, যা কিছু আমি পেয়েছি তা তো খোদাতাআলারই দান। আমি এসবের মালিক নই। আমি তো একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি তো জিজ্ঞাসিত হবো। এজন্যে আমার অধিক কঠোরতা দেখানো উচিত নয়।

যখন আমিত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় বা আগে থেকেই তা সঞ্চিত থাকে কিন্তু তা কষ্টকর ইচ্ছা-শক্তির ব্যাপারে হলে বা মাঝ পথের বাধার প্রসঙ্গে হলে সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিকার রয়েছে ঃ

১। প্রথমতো সেই **বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণের সাদৃশ্য সৃষ্টি করা** যা আগে বর্ণনা করে এসেছি যে, বাহ্যিকভাবে মানুষ অভিনয় করে কাজ করে। এর প্রভাব অভ্যন্তরে পতিত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এর ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

২। দ্বিতীয় প্রতিকার **পরিপূর্ণ একগ্রতা**। সফলতার জন্য এ ফরমূলা বিশেষ প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য এই যেন মানুষ একদিকেই ধেয়ান পরিচালিত করে। আর নিজের মন থেকে খোদাতাআলা ছাড়া অবশিষ্ট সবকিছুর ধ্যান-ধারণা মিটিয়ে দেয়। কুরআন করীমে এসেছে *ওয়ান্নাযিআতি গরক্বান-* যে-ব্যক্তি কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে চায় এতে নিমগ্ন হয়ে গিয়েই যেন সে নিজের ধ্যান-ধারণাকে এভাবে পরিচালিত করে কেবল সেই কাজই তার উদ্দেশ্য হিসেবে বাকী রয়ে যায়। তার নিকট অন্য কোন কিছুর আর খবর থাকে না। যখন কোন কাজের প্রসঙ্গে মনে পুরোপুরি চিত্র অংকিত হয়ে যায় তখন তাতে সফলতা আসতে পারে। যেমন এক ব্যক্তির যেভাবে মিথ্যে বলা অভ্যাস হয়ে যায়, সে এটা মনে করে, আমার মিথ্যে পরিহার করা আবশ্যক। তাই তাতে কাজ হবে না যতক্ষণ রাত দিন তার ধেয়ান সেই দিকেই না থাকবে, মিথ্যে বলা উচিত নয় এবং মিথ্যে পরিহার করা দরকার। একই কথা বার বার মনে করার ফলে এ শক্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ শক্তির ব্যাপারে বিপদও হয়ে থাকে। কেননা, সে পাগল হয়ে যায় অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদিক-সেদিক নাচতে থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে থাকে, নামাযে নানা প্রকার চিন্তা আসে এটা দূরীভূত হওয়ার জন্যে কোন পন্থা বাত্‌লিয়ে দিন। নানা প্রকার উদ্ভট চিন্তা আসার অর্থ, এমন সব ব্যক্তির এই ধ্যান-ধারণা শক্তি উন্মাদ হয়ে গেছে। আর একাগ্রতা তো সৃষ্টি হয়ে যায় কিন্তু খোদাতাআলার প্রতি নয় বরং অন্যান্য জিনিসের প্রতি। এটা কখনো কখনো খোদাতাআলার প্রতি নিবন্ধ হয়। এটা অন্য কোথাও আবার পালিয়েও যায়। সুতরাং যেসব লোকের নামাযে উদ্ভট চিন্তা আসে তাদের ব্যাপারে এ ধারণা ত্রুটিপূর্ণ যে, তাদের একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। আসল কথা এই, তাদের একাগ্রতা ইচ্ছা-শক্তির কবলে থাকে না, স্বয়ং কর্তায় পরিণত হয়ে যায় এবং যেখানে খুশি সেখানে চলে যায়।

এমতাবস্থায় একে ইচ্ছা-শক্তির আয়ত্তাধীন রাখার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। নামাযে যে-ব্যক্তি অন্য খেয়ালের শিকার হয়ে যায় এর অর্থ এই, তার ধ্যান ইচ্ছা-

শক্তির কব্জা থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সর্বপ্রথম কাজ হলো একে ইচ্ছা-শক্তি আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। এখন প্রশ্ন উঠে, একে কিভাবে আয়ত্তাধীন করা যায়? এর আসল উত্তর তো আমি পরে দেবো। তবে আর একটি ব্যবস্থাপত্র বলে দিচ্ছি আর তা এই, এসব লোক নামাযে জোর করে ধ্যান নিবন্ধ করার ধারণা যদি পরিত্যাগ করে তাহলে তাদের এমন অবস্থা হবে না। স্বাভাবিক কাজ-কর্মের ন্যায় নামায পড়ে।

তৃতীয় বিষয় হলো ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ। ইচ্ছা করে যে, আমি এ কাজ করতেই থাকবো। আর কোন বাধার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না। কখনও কখনও ইচ্ছা-শক্তি দুর্বল হয়ে থাকে। এজন্যে মানুষ একটি কাজের ইচ্ছা করে অথচ করতে পারে না। তাই আমি **ইচ্ছা-শক্তিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করার জন্যে একটি ব্যবস্থাপত্রের প্রস্তাব করছি**। এতে চৌদ্দটি ঔষধ রয়েছে। কুরআন করীম ও হাদীস থেকে এগুলো লাভ হয়ঃ

১। প্রথম এই, মানুষ এ আয়াতকে বার বার পাঠ করে, *ওমা খালাক্তুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লিইয়াবুদূন*-খোদাআলা বলেন, আমি মানুষকে কেবল ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ নিজের বান্দা বানাবার জন্যে সৃষ্টি করেছি। মানুষ এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখে আর বলে, আমাকে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর নৈকট্যের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আর খোদাতাআলার সৃষ্টি বিনষ্ট হতে পারে না। আমি অবশ্যই তাঁর বান্দায় পরিণত হবো। আমাকে দিয়ে কিছুই হতে পারে না– সে যেন এটা মনে না করে। তাঁর বান্দা হবো না, এমন হতেই পারে না; বরং সে এভাবে নক্‌শা আঁকে আর এভাবে কল্পনা করে যেন খোদাতাআলা তাকে ধরে নিয়ে গেছেন এবং বলছেন, ওঠ, কাজ কর। এটা এক কথাই যাকে সূফীরা 'মোরাকাবা' বলেন। এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ ঘাড় বিনত করে বসে থাকে বরং এর অর্থ এই, বারে বারে চিন্তা করে আর গভীরভাবে চিন্তা করে– খোদাতাআলা আমাকে বান্দা হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন আর আমি অন্য কিছু হয়ে যাই– এটা কি কখনও হতে পারে!

২। এ আয়াতের বিষয়-বস্তুর ওপর চিন্তা করে, *লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসানা ফী আহসানি তাক্বীম*-খোদাতাআলা আমাকে উৎকৃষ্টতর শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। যেই পুণ্য মানুষের পক্ষে করা সম্ভবপর আমার জন্যেও তা করা সম্ভব। আর যতটা উচ্চ মার্গে আরোহণ করা সম্ভব তা আমার জন্যেও সম্ভব। তাহলে পরে কি করে আমার পতন হতে পারে! এ বিষয়েও খুব কল্পনা করে এবং বার বার এর ওপর চিন্তা করে।

৩। তৃতীয়ত এ আয়াতও বার বার পাঠ করে *নাহনু আক্বরাবু ইলায়হে মিন হাবলিল ওয়ারীদ*-আর এ রঙ্গে এর তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করে আর একে মস্তিষ্কে এঁকে দেয় যে, আমাকে খোদাতাআলা সৃষ্টি করেছেন আর অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে এমন সব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দুষ্ট প্ররোচনা সম্বন্ধে তিনি অবহিত এবং অন্তরকে ব্যাকুলও করতে পারে, এমন কি তিনি মানুষের আত্মার চেয়েও তার অতি নিকটে। আত্মা যখন কু-প্ররোচনা সৃষ্টি করে তিনি তৎক্ষণাৎ তা মিটিয়ে দিতে পারেন। খোদাতাআলা এ আয়াতের মাঝে এসব বিষয়ে বর্ণনা করেছেন আর বান্দাকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, ভয়ের কারণ কি যখন কুপ্ররোচনা সৃষ্টির উপকরণের চেয়ে কুপ্ররোচনা মিটানোর উপকরণ নিকটেই রয়েছে?

৪। এ আয়াতের ওপরে চিন্তা করে- *ওয়া লিল্লাহিল ইয্‌যাতু ওয়া লি রসূলিহী ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়া লাকিন্নাল মুনাফিকীনা লা ইয়া'লামূন*। এ প্রসঙ্গে এভাবে চিন্তা করে, আমি মু'মিন আর মু'মিন কারো দ্বারা পরাভূত হতে পারে না। আবার আমার ইচ্ছা-শক্তি জয় লাভ করবে না তা কিভাবে হতে পারে? একে এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করে যে, ইচ্ছা-শক্তি আত্মার ওপর জয় লাভ করে ফেলে।

৫। এ আয়াত বার বার পাঠ করে- *ইন্না 'ইবাদী লায়সা লাকা 'আলায়হিম সুলতান* অর্থাৎ খোদাতাআলা বলেন, আমার বান্দার ওপর শয়তানের কর্তৃত্ব নেই। সে চিন্তা করে, আমি খোদাতাআলার বান্দা আর খোদার বান্দাদের ওপর শয়তানের জবর-দখল হতে পারে না। তাহলে পরে কি করে মন্দ আমার ওপর বিজয়ী হতে পারে?

৬। এ আয়াত পাঠ করে- *লা খওফুন 'আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্‌যানূন*- আর মনে করে আমি খোদাতাআলাকে ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমি মু'মিন আর মু'মিন খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

৭। এ আয়াতের ওপর চিন্তা করে *নাহনু আওলিয়াউকুম ফিল্ হায়াতিদ্ দুন্‌য়া ওয়া ফিল আখিরাতি*- মু'মিন হলে তার ওপর ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, আমরা তোমাদের সাহায্যকারী। তাহলে তোমরা কেন ঘাবড়িয়ে যাচ্ছ?

৮। *ওয়ালা তাইয়াসূ মির্ রওহিল্লাহি ইন্নাহূ লা ইয়াইয়াসু মির রওহিল্লাহি ইল্লাল ক্বওমুল কাফিরূন*-আয়াত পাঠ করে এবং চিন্তা করে, বিপদ-আপদে নিরাশ হতে নেই। নৈরাশ্য মৃত্যুতুল্য। একে গ্রহণ করার জন্যে আমি প্রস্তুত নই। মন না যদি মানে তাহলে আমি তাকে মানিয়েই ছাড়াবো।

৯। এ আয়াতের প্রতি চিন্তা করা দরকার-*ইয়াআইয়্যাতুহান্নাফসুল মুত্বমাইন্না তুরজিঈ ইলা রব্বিকি রাযিয়াতাম্মারযিয়্যাতান ফাদখুলী ফী 'ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতী*- আমি নিশ্চিত এবং অসীম আশা-ভরসা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাহলে পরে আমি কিভাবে ঘাবড়াতে পারি যখন খোদাতাআলা আমার সাথে আছেন আর বলছেন- যাও সেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো? এটা কখনও বিনষ্ট হতে পারে না।

১০। ইউযা'উ লাহুল কুবূলু-হাদীসের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং চিন্তা করা দরকার, মু'মিনের প্রসঙ্গে তো আল্লাহ্‌তাআলা অঙ্গীকার করেন, তার গ্রহণীয়তা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করানো হবে এবং সে লাঞ্ছিত হবে না। এতেও ইচ্ছা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১১। *ওয়া সাখ্‌খরালাকুম মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরযি জামি'আম্মিন্‌হু ইন্না ফী যালিকা লা আয়াতিল্লিক্বওমিঁইয়াতাফাক্কারুন*-আয়াতের ওপর চিন্তা করে আর এ মনে করে যে, সব বিফলতা লালসা ও ঈর্ষা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু আমার কোন জিনিসের প্রতি ঈর্ষা নেই। খোদাতাআলা প্রথমেই আমার জন্যে সবকিছু কি সৃষ্টি করেন নি?

১২। *মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ আশিদ্দা-উ 'আলাল কুফ্‌ফারি রুহামাউ বায়নাহুম*-এতে এই চিন্তা করে যে, কু-ধারণা-কু-প্ররোচণা ও কু-প্রেরণা আমার প্রাণে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারে না। কেননা, আমি এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, যে প্রসঙ্গে খোদাতাআলা বলেন, *আশিদ্দা-উ 'আলাল কুফ্‌ফারি রুহামাউ বায়নাহুম*-অর্থাৎ সে কাফিরদের প্রভাব গ্রহণ করে না বরং মু'মিনদের প্রভাব গ্রহণ করে।

১৩। *কূনূ মা'আস সদিকীন*- বেশি বেশি পাঠ করে। আর এ হাদীস সম্বন্ধেও চিন্তা করে- লা ইয়াশ্‌কা জালিসুহুম-সে মনে করে, যে পুণ্য আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। খোদাতাআলা বলেন, পুণ্যবানদের নিকট যাও। আমার একার কথায় প্রভাব সৃষ্টি না হলে আমি মু'মিন হতে পারি না।

১৪। এ কথার উপরে চিন্তা করে, আল্লাহ্‌তাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ *ওয়ামা জাআলনা লি বাশারিম্মিন ক্বলিকাল খুল্‌দা-আফাইম্মিতা ফাহুমুল খালিদূন*-আমি তোমাকেও নয় আর অন্য কোন মানুষকেও সব সময়ের জন্যে এ পৃথিবীতে অবস্থান করার জন্যে সৃষ্টি করি নি। মানুষ যেন চিন্তা করে, যখন আমি সব সময়ের জন্যে এ পৃথিবীতেই থাকবো না তখন আমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

এ ১৪টি কথায় ইচ্ছা-শক্তির তাকাৎ বা শক্তি লাভ হয়ে থাকে। তার আবেগ ও উদ্দীপনাকে দাবিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু শর্ত এই, মানুষ যেন এ সব কথার ওপর পরিপূর্ণভাবে চিন্তা-ভাবনা করে।

৪। চতুর্থ চিকিৎসা হলো **ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ়** করা বা এর পথ থেকে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা। অর্থাৎ যেসব দোষ-ত্রুটি দূর করতে হয় তা দূর করা। এর বিরুদ্ধে একেবারে প্রথম দিন থেকেই অভিযান আরম্ভ করে দেয়া। যখন সেনাবাহিনী কোন স্থানে আক্রমণ করে তখন প্রথম আক্রমণেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। কোন মন্দ দূর করার ব্যাপারেও এভাবেই করা উচিত অর্থাৎ যে মন্দ দূর করা দৃষ্টিতে থাকে এর ওপর পুরো জোর লাগানো উচিত।

৫। পঞ্চম চিকিৎসা এই, **পুণ্য স্বভাব সৃষ্টি করা** দরকার। এর অভ্যাস করে বা যে স্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত এর বিপরীত অভ্যাসের অনুশীলন শুরু করে দেয়। যেমন, রাগ ওঠলে কোমলতার অনুশীলন করে।

৬। **চিন্তা ও ধ্যানের অভ্যাস করে**। তরিঘড়ি করে কাজ না করে। আগেই তার মাঝে যেসব অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকবে এ দিয়ে এটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। কেননা, অভ্যাসগুলো তড়িঘরি করার স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণ করে থাকে আর চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করলে সে আক্রমণ করতে পারে না।

৭। যা করার বা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে এর পুরোপুরি মাহাত্ম্যকে মাথায় রাখার চেষ্টা করে এবং এর সবদিকের ওপর চিন্তা করে। এমন কি এর একটি পরিপূর্ণ নক্শা তার মনে অঙ্কিত হয়ে যায়। এর ফল এই দাঁড়াবে, যে কাজ করতে হবে তা সে নির্বিঘ্নে করতে পারবে আর যা পরিত্যাগ করতে হবে তা অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারবে।

৮। যেসব বিষয় বৈধ সেগুলোর প্রতি তার আকর্ষণ হয়। সেগুলোকে কোন কোন সময় পরিত্যাগ করে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার অভ্যেস সৃষ্টি হয়। যেমন, এক ব্যক্তির চুরির অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আর দূরীভূত হচ্ছে না। তাই তার উচিত কোন কোন বৈধ বিষয়কে, যার দিকে তার ঝোঁক আছে সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া আরম্ভ করে দেয়া। যেমন, কোন এক সময়ে মনে চাইল ঘুমাই অথচ ঘুমালো না। একটি জিনিস খেতে মন চাইল অথচ খেলো না। এভাবে মনে শক্তি সঞ্চার হতে থাকবে। হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথা আছে। আমি এর এই অর্থই বুঝি। তিনি (রাঃ) বলেছেন, 'আরাফতু রব্বি বি ফাসখিল 'আযাইমি অর্থাৎ আমি দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাকে বার বার ছিন্ন করে আমার খোদাতাআলাকে চিনেছি। এর অর্থ এই, আমি কোন কোন ইচ্ছা করেছি তা সফল হয় নি আবার আমি ইচ্ছা করেছি পুনরায় বিফল হয়েছি। কিন্তু যখন আমি বার বার ইচ্ছাগুলোকে বিফল হতে দেখা সত্ত্বেও সেগুলোকে করা ছেড়ে দেই নি এবং সাহস হারাই নি তখন আমি খোদাতাআলাকে লাভ করেছি। আমি ইচ্ছাকে ভঙ্গ করে ফেলার পরে যদি

নিরাশ হয়ে বসে যেতাম তাহলে পরে সংকল্প করতাম না। তখন আমি খোদাতাআলাকে পেতেও বিফল মনোরথ হতাম।

৯। মানুষের বার বার নিজ আত্মাকে নিরীক্ষণ করা। যেভাবে একজন চিকিৎসক রোগীকে বার বার দেখে থাকেন। এভাবেই সে নিজ আত্মাকে দেখে।

১০। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। মাঝামাঝি অবস্থায় যেন পরিতৃপ্ত না হয়। যে- বস্তু লাভ করতে যায় এর চূড়ান্ত সীমার প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যে-ব্যক্তি সর্বোচ্চ মার্গের ইচ্ছা-পোষণ করে তার কিছু না কিছু লাভ হবেই। এভাবে মানুষ নিজ আত্মার ওপর বিজয় লাভ করে।

এ চেষ্টা ছাড়াও আরও একটি ফর্মূলা রয়েছে। আর তা হ'ল দোয়ার ফর্মূলা। যখন মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কোন কিছুই না হয় তখন তার বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রথম বিষয় হ'ল নিজের চেষ্টা যা অন্য কথায় অভ্যন্তরীণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা। আর অন্যটি হ'ল বাহ্যিক সাহায্য। মানুষ নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে এবং সাথে সাথে খোদার নিকট দোয়াও করে, আমাকে দিয়ে যা কিছু হতে পারতো তো হচ্ছে। এখন তুমি সাহায্য করলেই কাজ হতে পারে। একজন বুযুর্গের বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। তাঁর একজন শিষ্যের সূফী তত্ত্বের প্রতি খুবই ঝোঁক ছিলো। সে তা শেখার জন্যে অনেক দিন তাঁর নিকট অবস্থান করলো। যখন সে ফিরে যেতে লাগলো তখন সেই বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশে কি শয়তান আছে? সে অবাক হয়ে বলতে লাগলো, শয়তান আবার কোথায় না আছে! বুকুর্গ বললেন, যখন তুমি তোমার দেশে পৌঁছবে তখন শয়তান তোমাকে আক্রমণ করলে তুমি কী করবে? সে বল্লো, আমি তার মোকাবেলা করবো। বুযুর্গ বল্লেন, ভাল কথা, তুমি শয়তানের সাথে মোকাবেলা করলে আর সে পালিয়ে গেলো। কিন্তু পুনরায় তুমি খোদাতাআলার দিকে ধ্যান নিবন্ধ করতে লাগলে সে পেছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেল্লো, তখন কী করবে? সে বল্লো, আমি পুনরায় তার মোকাবেলা করবো। বুযুর্গ বল্লেন, তুমি এভাবে শয়তানের মোকাবেলা করতে থাকলে খোদাতাআলার প্রতি কিভাবে ধ্যান নিবন্ধ করতে পারবে? সে বল্লো, তাহলে আপনিই বলুন এহেন অবস্থায় কি করা উচিত? তিনি বললেন, বলো, তুমি কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে। তার বাড়িতে একটি কুকুর রয়েছে এবং সেটা তোমাকে আক্রমণ করেছে, তখন কী করবে? সে বল্লো, আমি তাকে লাঠি দ্বারা পেটাবো। তিনি বল্লেন, কুকুর ভেগে গিয়ে যদি পুনরায় তোমাকে আক্রমণ করে বসে তখন কী করবে? সে বল্লো, বাড়ীর মালিককে ডাকবো, এস! তোমার কুকুরকে শামলাও। তিনি বললেন, শয়তানের ব্যাপারেও এ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। খোদাতাআলাকে বলতে হবে, আমি

তোমার নিকট আসতে চাই; কিন্তু শয়তান আমাকে আসতে দিচ্ছে না। তুমিই একে দূর করো। অতএব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম এ-ও যে, মানুষ দোয়া করে, হে খোদা! আমি নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করছি, এখন তোমার সাহায্যেরই আমি প্রত্যাশী।

দশম কথা আমি এই বলেছিলাম, মানুষ যেন নিজ উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখে। এক বন্ধু এর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে, উচ্চ কামনা-বাসনাও কি বৈধ? আমার দৃষ্টিতে এটা বৈধ নয়। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এটা লিখেছেন, ওহী ইলহাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য উচ্চ হওয়া আর কোন ব্যাপারে আশা ও ঈর্ষার মাঝে বড়ই পার্থক্য রয়েছে। ঈর্ষার তাৎপর্য এই, মানুষ ভাল জিনিষ দেখলে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হয় যে. তা যদি পেতাম; কিন্তু উদ্দেশ্য বলতে বুঝায়, যা আগে থেকে নির্ধারণ করে নেয়া হয়। যে লোভী সে তো কেবল ফকীরের মত হাত পেতেই থাকে; কিন্তু যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে কাজ করে সে-তো উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন এবং অধিক সাহসের অধিকারী।

ইলহাম প্রত্যাশীর অবস্থাও এটাই। ইলহাম এক প্রকার আহ্বান যা খোদাতাআলা তাঁর কোন বান্দাকে দিয়ে থাকেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমি অমুক বন্ধুর সাথে তার ওখানে ভাল দাওয়াত খাবার জন্য সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি; তখন এটা কতইনা খারাপ কথা হবে এবং সকলে তাকে মন্দ ভাববে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি অমুক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতেই যাচ্ছি। সেখানে যত ভাল দাওয়াত লাভই হোক না কেন, তাকে কেউ মন্দ বলবে না। ইলহামের প্রত্যাশীর অবস্থাও তা-ই। যখন কেউ দোয়া করবে, হে খোদাতাআলা! আমাকে উচ্চ মার্গে পৌঁছে দাও এবং তোমার নৈকট্য দান কর তখন সেই মর্যাদা লাভ হলেই তার ইলহামের দাওয়াত লাভ হবে। কিন্তু কেউ যদি এই আকাঙ্ক্ষা করে আমার ওপর ইলহাম হোক তখন এর অর্থ এ, সে এ আহ্বানের প্রত্যাশী। খোদাতাআলার নৈকট্যের প্রতিও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এজন্যই ইলহাম লাভের প্রত্যাশা করা সঠিক নয়।

এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। আমি যেসব নীতির কথা বলেছি, এগুলোর ওপর আমল করা সত্ত্বেও যদি পুণ্যকর্মে উৎকর্ষ লাভ না হয় আর অনিষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা না পায় তাহলে মনে করা উচিত তার আধ্যাত্মিক রোগ নেই বরং দৈহিক রোগ রয়েছে। তার স্নায়ুতে দুর্বলতা রয়েছে। এমনই অবস্থায় তার ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া অবশ্যই কর্তব্য। আর যদি এ সুযোগ না থাকে তাহলে এ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার ঃ ১। ব্যায়াম করে ২। মানুষিক পরিশ্রম বন্ধ করে ৩। উত্তম খাবার গ্রহণ করে ও ৪। নিজের মনের সন্তুষ্টি পোষণ করার চেষ্টা করে।

এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক, কখনও কখনও রোগ-ব্যাধি আত্মিক কুসংস্কার থেকেও সৃষ্টি হয়। যেভাবে দুশ্চিন্তা থেকে দৈহিক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। তেমনিভাবে আত্মিক দুশ্চিন্তা থেকে আধ্যাত্মিক রোধ-ব্যাধিতেও পেয়ে বসে। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা এই, যখন আমি হেকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করেছিলাম তখন যে রোগ সম্বন্ধে পড়তাম সে সম্বন্ধে মনে হতো, আমারও রোগ রয়েছে। এ ধারণা করতাম সম্ভবত আমারও এ একই অবস্থা হবে। কিন্তু এ ডাক্তারের ছাত্ররা আমাকে বলেন, তাদের শিক্ষক ক্লাসে উপদেশ দিয়েছিলেন, ছাত্রদের এ ধরনের কল্পনা সৃষ্টি হতো। তাদের এতে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। এ জন্যে আমিও আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, এমন যেন না হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে এটা বুঝতে থাকা, এটা আমাদের মাঝেও রয়েছে। এভাবে নিজেদেরকে অযথা রোগাক্রান্ত করে ফেলো না। শুনেছি একজন শিক্ষক ছিলেন, সে ছাত্রদের উপরে নির্যাতন চালাত। একদিন ছাত্ররা মনে করল কোন-ভাবে ছুটি নিয়ে নেয়া উচিত। একটি ছাত্র বলল, আমাকে যদি সমর্থন কর তাহলে আমি ছুটি নিয়ে দেবো। আমি গিয়ে বলবো, স্যার! আপনার আজ কী হয়েছে? আপনার মুখ পাংশু বর্ণের মত হচ্ছে! পরে তুমি আসবে আর আমার কথায় সায় দেবে। ছাত্ররা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এরপর সেই ছেলেটি গিয়ে বল্লো, স্যার! ভাল আছেন তো? স্যার বললেন, কি বক বক করছিস। যা নিজের কাজ করগে। সে বলল, আপনার চেহারা পাংশু বর্ণের মত হচ্ছে কেন? এরপর শিক্ষক তাকে গালি দিলেন। আর দ্বিতীয় একজন এগিয়ে আসলো। সে এসেও এ রকমই বলল। তাকেও গালি দিলেন। কিন্তু এবারে কিছুটা কম। পরিশেষে ছাত্ররা পর্যায়ক্রমে আসতে থাকলো এবং এভাবেই বলতে থাকলো। ষষ্ঠ সপ্তম ছেলে পর্যন্ত শিক্ষক এতটা মেনে নিলেন শরীর একটু খারাপ মনে হচ্ছে। তোমরা তো এমনিতেই পেছনে পড়ে গেছো। যখন পঞ্চদশ / ষষ্ঠদশ ছাত্রটিও বলল। তখন শিক্ষক বলতে লাগলেন, কিছুটা জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। আচ্ছা শুয়ে থাকি। এ মনে করতে করতে তার জ্বর উঠে গেল এবং ছাত্রদের ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। ছাত্ররা বাড়ি গিয়ে তাদের মাকে বলল, শিক্ষক অসুস্থ হয়ে গেছেন তাকে দেখতে যাওয়া দরকার। যখন মহিলারা তার ঘরে যেতে থাকলেন আর রোগের কথা বলতে থাকলেন তখন তিনি মনে করলেন, আমার তো খুব কঠিন রোগ হয়েছে। পরিশেষে এ রোগেই তিনি মারা গেলেন।

এতো একটি কাহিনী। কিন্তু ইউরোপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, যখন থেকে পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে রোগ-ব্যাধি বেড়ে গিয়েছে। এসব ঔষধের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতারা এতো বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে থাকে যে, সকল প্রকার

রোগই লিখে দেয়। এ ঔষধ সর্বপ্রকার রোগের মহৌষধ। পাঠকরা নিজেকে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত মনে করে নেয়। পরে তাদের কুধারণা বাড়তে থাকে এবং তাদেরকে প্রকৃত রোগী বানিয়ে তবে ছাড়ে। সুতরাং কু-ধারণায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় কথা এটা বুঝে নাও, জাতীয় পর্যায়েও আবশ্যক যেন অশ্লীলতার প্রচার করা না হয়। কোন কোন লোকের অভ্যাস হয়ে যায়, তারা অযথা লোকদের বদনাম করার জন্যে এটা বলা আরম্ভ করে দেয়, এখানকার সবলোক বদমায়েশ ও অন্যদের অধিকার খর্ব করে। প্রথম প্রথম কিছু লোকতো তার বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে; কিন্তু সে-ও এভাবে বলে যেতে থাকে যে, এমন লোক যদি থেকেও থাকে তাহলে তাদের ঘরে রয়েছে আমাদের তাতে কি আসে যায়। আবার এ থেকে সম্মুখে আগায় আর একথা বলে, এমন সবলোক আছে তো ঠিকই কিন্তু আমরা কি করতে পারি? পরে ধীরে ধীরে এমন কি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে-ও বলতে থাকে, সব লোক অসদাচরণকারী ও বদমায়েশ হয়ে গেছে। এমন লোকদের কথায় কান দেয়া উচিত নয়। নচেৎ মানুষ স্বয়ংই সেই মন্দ আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়বে। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি কারো ওপর অভিযোগ উত্থাপন করে, সে স্বয়ং এমনই হয়ে যায়। এভাবে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য যে-ব্যক্তি অশ্লীলতার প্রচার করে তার মোকাবেলা করা উচিত। আর তার নিকট দাবী করা দরকার, যে খারাপ তার নাম নাও। চিহ্নিত কর সাধারণভাবে সকলকে জড়াও কেন যে, সবলোক এমন হয়ে গেছে? যে খারাপ হয়ে গেছে তার কথা বলো আর যে মন্দ কাজে সে লিপ্ত হয়ে গেছে তা-ও বলো। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে জাতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তা নষ্ট হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তিই তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। অর্থাৎ লোকদের বলা যে, আমাদের জাতি বিনষ্ট হয়ে গেছে এ ধারণা জাতিকে এমনই বানিয়ে ছাড়বে। তাই সর্বদা এমন জাতীয় শত্রুর মোকাবেলা করা উচিত, যে অশ্লীলতা প্রচার করে এবং জাতিকে মন্দ আখ্যায়িত করে। কিন্তু এর সাথে সাথে আমি এটাও বলছি, যে জাতি নির্ভয় হয়ে যায় সে জাতিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রকৃত চিকিৎসা এই, এমন প্রত্যেকটি বিষয়ে, যা কারো মন্দ প্রসঙ্গে হয়ে থাকে, তা আদেশ দেবার অধিকারী ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো উচিত যেন তিনি তা পরখ করেন। সেই দুর্বলতা যদি প্রকৃতই থাকে তাহলে তা সংশোধনের চেষ্টা করে।

এ বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার অনুমান ছিলো, একদিনে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু যখন আমি এর নোট লিখতে থাকি তখন দু'দিনে শেষ হয়ে যাওয়ার ধারণা করেছিলাম। কিন্তু এখনও নীতিগত ৪০টি ফর্মূলা সম্বন্ধে বলা বাকী রয়ে গেছে।

আল্লাহ্‌তাআলা সৌভাগ্য দিলে পুস্তকে লিখে দেয়া হবে অথবা অন্য কোন সময়ে বলে দেয়া হবে। ৪০টি ফর্মূলা এখন এমন অবশিষ্ট রয়ে গেছে যাতে জানা যেতে পারে, মানুষ কিভাবে পুণ্যবান হতে পারে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের কথার ওপর এ বক্তৃতা শেষ করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের কথা এমন যাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলে গেছেন, আমরা যদি পুণ্যবান না হই তাহলে আমাদের জামাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, এ অবস্থায় আমাদের জামাত খোদার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এ জন্য চেষ্টা করা দরকার, আমরা সেসব নৈতিক গুণ সৃষ্টি করি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের জন্যে আবশ্যিক করে দিয়েছেন। আমি আশা করি এসব বন্ধু যারা আমার এ বছরের বক্তৃতার পরে যে নোট নিয়েছেন আর যারা বক্তব্য শুনেছেন তারা ব্যবহারিক জীবনে এসব পদ্ধতিকে অবলম্বন করবেন যেন আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারি বাহ্যিক কর্মসমূহের ব্যাপারেও আমাদের জামাতের সমান কেউ নেই। সত্য কথা এই, আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ওলী আল্লাহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিশ্বকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে না আর আমরা বিশ্বে কোন পরিবর্তন সাধনও করতে পারবো না। মনে রেখো! আমাদের মোকাবেলা দুনিয়ার বর্তমান অনিষ্টের সাথেই নয় বরং আমাদেরকে মন্দ ধ্যান-ধারণার মোকাবেলাও করতে হবে। আর আমাদের ধ্যান-ধারণার সেই প্রবাহের মোকাবেলা করতে হবে যা সবদিকে তরঙ্গায়িত। অতএব আমাদের অবস্থান খুবই স্পর্শকাতর। আমি বন্ধুগণের নিকট বিনয়ের সাথে এ আশা পোষণ করি, বন্ধুগণ এমনই রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আমাদেরকে বানাতে চান। এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ওপর বক্তব্য শেষ করছি এবং শেষে নিজেকেও দোয়ায় শামেল করছিঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ

"আমি কি করি আর কোথা থেকে এমন ভাষা নিয়ে আসি যা এমন মন্ডলীর (অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়ার) অন্তরে প্রোথিত করে দেই। হে আমার খোদা! আমাকে এমন ভাষা দাও এবং এমন বক্তৃতা ইলহামের মাধ্যমে শিখাও যা তাদের অন্তরে নিজ জ্যোতি বর্ষণ করে আর নিজ বিষ প্রতিষেধক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষ দূরীভূত করে দেয়। আমার প্রাণ এ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, কখন সেই দিন আসে যেদিন আমার জামাতে এত অধিক সংখ্যক লোক দেখি যারা আসলেই মিথ্যা পরিহার করেছে এবং নিজ খোদার সাথে একটি প্রকৃত অঙ্গীকার করেছে, তারা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে আর

সমস্ত অনিষ্টের মূল অহংকার থেকে এমন একেবারেই দূরে চলে যাবে। এবং স্বীয় প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করতে থাকবে"।

"আমি দোয়া করছি এবং যখন পর্যন্ত আমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, করতে থাকবো আর দোয়া এই-ই যেন, খোদাতাআলা আমার এ জামাতের লোকদের প্রাণকে পবিত্র করে দেন এবং স্বীয় কৃপার হাতকে লম্বা করে তাদের অন্তর তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেন ও সর্ব-প্রকার অনিষ্ট ও ঈর্ষা তাদের মন থেকে উপড়িয়ে ফেলেন এবং পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, এ দোয়া কবুল হবে এবং খোদা আমার দোয়াকে বিনষ্ট করবেন না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ দোয়া কবুল হবে এবং খোদাতাআলা ওগুলোকে বিনষ্ট করবেন না। কিন্তু তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গে পরিণত হবে, না পরবর্তীতে আগমনকারীরা? পরে আগমনকারীদের পক্ষে যদি এ দোয়া কবুল হয় তাহলে পরে আমাদের লাভ কী? এজন্যে আমি বলি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে চেষ্টা চালাও আমরাই যেন সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হই আর এ দৃশ্য দেখে আমাদের হৃদয়ে শীতলতা পৌঁছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চিত্রায়িত করেছেন।

এর পরে আমি দোয়া করে জলসা সমাপ্ত করছি এবং যারা যেতে চান তাদের যাবার অনুমতি দিচ্ছি। বই এর লাইব্রেরীর মালিকরা বলছেন, আমি যেন তাদের প্রকাশিত পুস্তিকাদি নিয়ে যাবার জন্যে সুপারিশ করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তিকাদি যেন বন্ধুরা কিনে নিয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তিকাদি প্রচার করা আপনাদের অবশ্য-কর্তব্য। স্বয়ং কিনে নিন ও পাঠ করুন এবং ওগুলোকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিন অর্থাৎ অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করুন।

– o –